হাজার বছর ধরে... পৃথিবীর পথে

আবু তাহের মজুমদার

১

শিল্পীমাত্রই পথিক। চিরন্তন কোন পথের অভিযাত্রী। অভীষ্ট যাই হোক, এক অতৃপ্তি তাকে তাড়া ক'রে ফেরে। হয়ত পথের শেষ আছে—আছে পথের শেষে আরাধ্য ধন। তারপরও থেকে যায় একটা অন্তহীনতার অভিজ্ঞান। অনন্তকাল একটা রহস্যালোকে রূপহীন রূপ-নির্মাণের সাধনা শিল্পীমনকে নিমগ্ন রাখে। এরকম একজন পথিকের আমরা সাক্ষাৎ পাই বাংলা সাহিত্যের অন্যতম একটি অনন্যসাধারণ কবিতা 'বনলতা সেন'-এ। সেই সুদূর অতীতে তার যাত্রা শুরু। অন্তবিহীন পথ পেরিয়ে দুদণ্ড শান্তি পেয়েছিলেন চির-সাধনার চির-কামনার প্রায় চির-অধরা অনন্ত প্রেমিকার কাছে। অধরা তো বটেই। এ প্রেমিকাকে তো আলোতেই দেখেন নি কোনদিন। কোন ক্ষণে। দুঃসময়ে দেখেছেন। দেখেছেন যখন তিনি দিশেহারা নাবিক। দেখেছেন অন্ধকারে। নিরবয়ব। অথবা আপন মানস-ক্যানভাসে স্বপ্ন-কল্পনা-আবেগের তুলিতে আঁকা মূর্ত বর্ণনার অতীত কোন অবয়বে।

চিরন্তন প্রেমিক কবি হাজার বছর ধরে পৃথিবীর পথে হাঁটছেন। হাজার এখানে অবশ্যই এক হাজার নয়—একটি অসীম সংখ্যার প্রতীক। অর্থাৎ কবি—সৌন্দর্য-পিয়াসী শিল্পী, এক দুর্জ্ঞেয় নান্দনিক বোধে আলোকিত অন্তরলোকের মানস-সুন্দরী-চেতনা তাড়িত কবি—হয়তো সৃষ্টির প্রথম প্রভাত থেকে যাত্রা শুরু করে বর্তমানের উপকূলে এসে উপনীত। Whitman-ও পথিকচিত্ততায় আক্রান্ত ছিলেন। কিন্তু জীবনানন্দের চলার শেষ আছে, কারণ অন্ধকারে হলেও তাঁর মুখোমুখি বসার কেউ আছে। Whitman-এর নেই : 'Myself moving forward then and now and forver', 'I tramp a perpetual journey'-এর একটা কারণ হয়তো এই যে Whitman-এর জীবন নারী-বিবর্জিত, যথার্থ অর্থে তিনি কোন প্রেমের কবিতাই লেখেন নি। তার ভুবনে কোন বনলতা সেন নেই। নেই কোন কমনীয় রমণীর হৃদয়মননন্দন মুখচ্ছবি। Whitman চিরকুমার ছিলেন এবং প্রেমিক কবি হিশেবে কখনো খ্যাত ছিলেন না। তাঁর কাছে অবশ্য 'body' এবং 'soul' উভয়ই তাৎপর্যমণ্ডিত—সৃষ্টির প্রবহমানতায় এবং অন্তর্নিহিত মর্ম উপলব্ধিতে উভয়েরই ভূমিকা রয়েছে। Whitman-এ যৌনতা আছে। কিন্তু জীবনানন্দ সে পথে চলেননি। তার হাজার বছর ধরে পথ হাঁটা এক নিটোল সৌন্দর্যের নান্দনিক বোধনের অনুপম এক অভিসার, যার মধ্যে যৌনতার ভূমিকা থাকলেও—চিরন্তন মানব-মানবীয় সম্পর্কের নিগূঢ় অন্তঃস্রোত থাকলেও—তা মানসের অতলে। 'Beauty of form' এবং 'form of beauty'-ই যেন তার চিত্তকে তুমুলভাবে আলোড়িত করেছে। অনুভবের অতলান্ততা, কল্পনার রূপনির্মাণকারী ক্ষমতা, অনুরাগের গভীরতা এবং ব্যাপকতা পরম প্রাপ্তির রুদ্ধশ্বাস তৃপ্তি, একটি পলায়নপর মায়াবীরূপ আর সৃষ্টির শুরু থেকে বর্তমান পর্যন্ত নিজের সত্তার ফল্গুধারা ইত্যাদিই ফুটে উঠেছে অনাদি অতীত থেকে যাত্রা শুরু করে এক সন্ধ্যায় মানসসুন্দরীর মুখোমুখি হওয়ায়। চকিতে আমাদের মনে পড়ে দেশে ফেরার জন্য অডিসিয়াসের সমুদ্রযাত্রার কথা আর সমুদ্রপথে অন্তহীন বাধাবিপত্তির কথা। আমাদের মনে পড়ে সোনালি লোমের খোঁজে জেসনের অভিযানের কথা।

২

কবিতাটি সমসংখ্যক—ছয়-লাইনের—তিনটি স্তবকের। প্রথমটির শুরু থেকেই আমরা জীবনানন্দের 'যাত্রার ধ্বনি' শুনতে পাই : হাজার বছর ধরে তিনি পৃথিবীর পথে হাঁটছেন; এ হাঁটা কোন সাধারণ হাঁটা নয়, একটি প্রত্যাশা-তাড়িত শিল্পীর অনন্তকাল ধরে হাঁটা; একটি অনুসন্ধানী হাঁটা; দেশ এবং কালের সীমা অতিক্রম করে লক্ষ্যে না পৌঁছা পর্যন্ত হাঁটা। এ হাঁটার কালিক এবং স্থানিক ব্যাপকতা পরিস্ফুট 'হাজার বছর ধরে' এবং 'পৃথিবীর পথে' এই বাক্যাংশ দুটির মধ্যে। 'হাজার' শব্দটি অসীমতার দ্যোতক এবং অনির্দিষ্টতাসূচক। একইভাবে 'পৃথিবীর পথে' বচনটিও অনির্দিষ্টতাসূচক, অতিক্রান্ত কোন সীমানার কোন ঠিকানার খোঁজ জীবনানন্দ আমাদের দেন না। প্রথম লাইনেই পাঠকেরা নিজেদের আবিষ্কার করেন অনন্তকাল এবং অন্তহীন পথের সুদূরপ্রসারী সুবিশাল দৃশ্যপটে। এখানে আরেকটা ব্যাপার লক্ষণীয়—কবির যাত্রাপথ আলোকোজ্জ্বল না অন্ধকার তা কিন্তু পাঠকেরা জানতে পারেন না। ধরে নেয়া যেতে পারে আলো এবং অন্ধকারের যুগপৎ বিস্তারের মধ্য দিয়েই এ যাত্রা। দ্বিতীয় লাইনে দৃশ্যপটে পরিবর্তন সূচিত হয়েছে—কবি এখন নাবিক। স্থলপথ ছেড়ে জলপথে তার অভিযাত্রা। শুধু তাই নয়, অনির্দিষ্টতার নিরবয়ব উপকূল ছেড়ে এখন তিনি মানচিত্রের চিহ্নিত সীমানায় উপনীত : সিংহল সমুদ্র এবং মালয় সাগরে অনেক ঘুরেছেন তিনি। কখন? —নিশীথের অন্ধকারে। শিল্পীর রহস্যময় গোপন যাত্রা—তাই অন্ধকারে। অথবা লক্ষ্যবস্তুর অবস্থান অজানা বলেই যাত্রাপথ যেন অন্ধকারের মধ্য দিয়ে। এবং অন্ধকার বলে দিক নির্ণয় করতে পারেন নি, তাই অনেক ঘুরেছেন। অথবা সিংহল সমুদ্র এবং মালয় সাগর বিশেষ হয়েও নির্বিশেষ জলপথের প্রতীক, তাই ঘোরাঘুরি হয়েছে অনেক। পৃথিবীর পথে হাঁটার মত। এরপর কবি তাঁর অতীতে অবস্থানের মানচিত্রের কিছুটা উন্মোচন করেন : তিনি বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে ছিলেন। ছিলেন আরও দূর অন্ধকারে বিদর্ভ নগরে। তাঁর ভৌগোলিক এবং ঐতিহাসিক অবস্থান সম্পর্কে পাঠকেরা কিছুটা আলোকিত হলেন। সাগর, নগর এবং নরপতিদের সম্পর্কে জানলেন। কিন্তু আচ্ছন্ন এবং আপ্লুত হলেন অন্ধকারে—নিশীথের অন্ধকারে, বিম্বিসার অশোকের জগতের ধূসরতায় এবং বিদর্ভ নগরের অন্ধকারে। অন্ধকার এখানে এক অন্তহীন রহস্যময়তায় পাঠকদের উদ্দীপ্ত এবং কৌতূহলী করে। শিল্পীর বিশেষ দৃষ্টি—চির-পথিক—প্রেমিক-শিল্পীর বিশেষ দৃষ্টি—অন্ধকারেও পথ খুঁজে নিতে পারে। এবং নিয়েছেও। তাই চির-পথিক এবং চির-নাবিক পৃথিবীর পথে হেঁটেছেন এবং সমুদ্রে ও সাগরে ঘুরেছেন অনায়াসে—পথভ্রান্ত না হয়ে। কোথায় কোথায় ছিলেন তা জেনেছেন এবং জানিয়েছেন। এই অনন্ত-যাত্রায় একসময়ে তিনি ক্লান্তির শিকার হয়েছেন। জীবনের চারিদিকে—অবশ্যই সমুদ্রচারী জীবনের—দেখেছেন ঘটনার ঘূর্ণাবর্ত—সমুদ্র সফেন। সভ্যতার উত্থানপতন। সৃষ্টি-স্থিতি-লয়। সিংহল সমুদ্র, মালয় সাগর, বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগত এবং বিদর্ভ নগরের স্মৃতির ভারে তিনি ভারাক্রান্ত। অনন্ত যাত্রাপথে কান্নাহাসির দোলাচল এবং পালাবদল তাঁকে অশান্ত করেছে। তাঁকে অশান্ত করেছে মানস-সুন্দরীর অনন্ত অন্বেষাও। সফেন সমুদ্রের কূলে প্রত্যাশী ছিলেন ক্লান্তি অপনোদনের নিরুপদ্রব কোন বন্দরের। না, কোন বন্দরে নয়,

তিনি অনন্ত যাত্রা শেষে শান্তি পেলেন নাটোরে এসে। না কোন দীর্ঘস্থায়ী শান্তি নয়। মাত্র দু-দণ্ডের। এ দু-দণ্ড হয়ত তাঁর কাছে অন্তহীন দু-দণ্ড। দু-দণ্ডের শান্তিই দিলেন বনলতা সেন। কীভাবে? —দ্বিতীয় স্তবকের শেষে কি এর উত্তর?—'কোথায় ছিলেন' এ প্রশ্ন করে? নাটোর—একেবারেই ভৌগোলিক, পরিচিত, কিছুটা হলেও কাছের একটি স্থানের নাম। আর বনলতা সেন? —কবে যেন কোথায় দেখা হয়েছিল। আবারও দেখা হতে পারে। হাজার বছর পথ হাঁটার পর কবি পৌছলেন নাটোরে। বনলতা সেনের কাছে। কিন্তু কবির শৈল্পিক পদক্ষেপে নাটোর হয়ে গেলো কল্পলোকের এক অনন্ত রহস্যের রূপময়ী নগর—বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতের মত। বিদর্ভ নগরের মত। শুধু পার্থক্য এই যে, ওসব স্থানে কবির আরাধ্য শান্তির উৎস ছিল না। আর বনলতা সেন চেনা চেনা ভাবের খোলস মুক্ত হয়ে হয়ে গেল এমন এক রহস্যময়ী নারী—যার কাছে পৌছতে অনন্ত যাত্রাপথের পথিক আর নাবিক হতে হয়। আটপৌরে কিন্তু কাব্যিক সুষমামণ্ডিত দুটি নাম জীবনানন্দের শৈল্পিক তুলির স্পর্শে অনুপম সৌন্দর্যের প্রতীকের রূপ লাভ করল। আমাদের কানে বাজতে থাকল মায়াবী সঙ্গীতের মত। অপূর্ব সুরমূর্ছনার মত।

প্রথম স্তবকে বনলতা সেন সম্পর্কে পাঠকচিত্তে যে কৌতূহল জাগে, দ্বিতীয় স্তবকে এসে কবি তা নিরসন করেন বনলতা সেনের রূপ বর্ণনায় এবং কীভাবে শান্তি দিয়েছিল তা নিশ্চিত করে : হাতে হাত নিয়ে নয়, মাথায় হাত বুলিয়ে নয়, গা ঘেঁষে বসেও নয়, শুধু কেমন ছিলেন নাটকীয়তার আমেজ-সমৃদ্ধ এই প্রশ্ন করে এবং অন্ধকারে নিজের ব্যক্তিসত্তা ও সপ্রেম উপস্থিতি সপ্রমাণ করে। কবিকে উদ্বেগ-অনুযোগ-কাতর প্রশ্ন করে। তার অবস্থান সম্পর্কে জানতে চেয়ে। দু-দণ্ডের শান্তি পেয়েছিলেন এ বক্তব্যের দ্বারা কবি কি উদ্বেগের নিরসন করেন? —নাকি এক অন্তহীন রহস্যময়তায় আরও উদ্বেল করেন পাঠক-চিত্তকে? যার ফলে বনলতা সেনের রূপকল্পনায় কেটে যাবে আরও হাজার বছর এবং তারপরও থেকে যাবে অনিবার্য এক অতৃপ্তি। বনলতা সেনের চুল অন্ধকার বিদিশার নিশার মতো, মুখ শ্রাবস্তীর কারুকার্যের মত এবং চোখ 'পাখির নীড়ের মত'। কবির চোখে কীভাবে প্রতিভাত হয়েছেন বনলতা সেন? —হালভাঙা দিশাহীন নাবিকের চোখে দারুচিনি-দ্বীপের ভিতরে সবুজ ঘাসের দেশের মত। কবি কোন নির্দিষ্ট বিদিশার নিশার মত অন্ধকারের কথা বলেন না, 'কবেকার' শব্দটা দিয়ে তিনি পাঠকদের নিক্ষেপ করেন এক অনির্দেশ অনিশ্চয়তার অন্ধকার জগতে। একে তো 'বিদিশার নিশা', তাও আবার 'কবেকার'? —হাজার বছর আগেকার কোন বিদিশার নিশা? —তাহলে কেমন কালো ছিল বনলতা সেনের চুল? এবার কল্পনা করা যাক শ্রাবস্তীর কারুকার্যের মত একটি মুখ, যেটির মত বনলতা সেনের মুখ। এখানেও পাঠকেরা নিক্ষিপ্ত অনির্দেশ অনিশ্চয়তার এক অন্ধকার জগতে। শ্রাবস্তীর কোন কারুকার্য? কোন্ অমর শিল্পীর কারুকার্য এটি? এটি কি কোন ভাস্কর্য, নাকি কোন গুহাচিত্র? কোন্ শিল্পী রেখা টেনে টেনে এঁকেছেন এমন এক কল্পসুন্দরীর চিত্র—মুখচ্ছবি, একমাত্র যেটির সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে বনলতা সেনের মুখের? তারপর ভাবা যাক চোখের কথা—কোন্ পাখির নীড়ের মত? এক এক পাখির নীড় তো এক এক রকম। ঝুলন্ত নীড়, নাকি ডালপালার সঙ্গে বিন্যস্ত কোন নীড়? এখানেও সেই একই অনিশ্চয়তা। কেমন ছিল বনলতা সেনের দেহবল্লরী? সবুজ ঘাসের দেশ-এর মত, যে সে সবুজ ঘাসের দেশ নয়—দারুচিনি দ্বীপের ভিতরের সবুজ ঘাসের দেশ। ঝড়ে বিধ্বস্ত নাবিকের চোখে দেখা সবুজ ঘাসের দেশ। অতিদূর সমুদ্র তখন উত্তাল। সবুজ ঘাসের দেশটির আবির্ভাব একটি সপ্রাণ, সজীব আশ্রয়রূপে—যেখানে হালভাঙা নাবিক নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখবে। উজ্জীবিত হবে নতুন আশায় এবং ভরসায়। এই দেশের সঙ্গে 'নীড়ের মত' চোখ সঙ্গতিপূর্ণ—কারণ

নীড় আশ্রয় ও নিরাপত্তার প্রতীক। কিন্তু পাঠকেরা আবার নিক্ষিপ্ত অনিশ্চয়তায়—বিদিশার নিশার মত চুল, শ্রাবস্তীর কারুকার্যের মত মুখ, সবুজ ঘাসের দেশ-এর মত শরীর এবং পাখির নীড়ের মত চোখের অপরূপাকে দেখেছেন অন্ধকারে। তাহলে চুল, মুখ, শরীর আর চোখের বৈশিষ্ট্যগুলো চিহ্নিত হলো কীভাবে? কবি অন্ধকারে তাকে দেখেছেন এবং তার প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছেন—'এতদিন কোথায় ছিলেন?' পাঠকেরা বুঝতে পারেন দীর্ঘ প্রতীক্ষারতা, পথ চেয়ে থাকা, কেউ এরকম একটা প্রশ্নই তো করবেন। যুগযুগান্তর ধরে অন্ধকারে কবির আগমন কামনায় উদ্বেল অধীর চিত্তে হৃদয়ের সব ভালবাসা নিয়ে, সব মায়ামমতা আর উৎকণ্ঠা নিয়ে অপেক্ষারতা ছিল যে বনলতা সেন, তার উদ্দেশে কবি যাত্রা শুরু করেছিলেন—এতদিন পৃথিবীর পথে হেঁটেছেন, সিংহল সমুদ্রে আর মালয় সাগরে ঘুরেছেন, বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে এবং আরও অতীতের বিদর্ভ নগরেও কবি ছিলেন। ক্লান্ত হয়েছেন। নিজেকে মনে হয়েছে দিশাহীন হালভাঙা এক নাবিক। শেষে এসে অন্ধকারে পৌছেছেন বনলতা সেনের কাছে। কবির চোখ বিশেষ চোখ। শিল্পীর চোখ। অন্ধকারে তিনি দেখতে পান। অপরূপার রূপ তাঁর দৃষ্টির সম্মুখে উন্মোচিত হয়। সব বৈশিষ্ট্য নিয়ে ভাস্বর হয়ে ওঠে। এ দৃষ্টি অন্তরের দৃষ্টি। বাইরের আলো নিভে গেলে শিল্পীর ভেতরের আলো জ্বলে ওঠে।

তৃতীয় স্তবকে এসে কবি বিশদ করেন তাঁর যাত্রা শেষের কথা। এবং প্রথমবার পাঠকেরা পান দিনের উল্লেখ। কিন্তু এ উল্লেখ ক্ষণিকের। দিনের কথা যখন উল্লিখিত হচ্ছে, তখন দিন শেষ হয়ে গেছে এবং 'শিশিরের শব্দের মতন' সন্ধ্যা আসছে। দিনের শেষের কোন বর্ণনা নেই। কোন ঘটনার বিবরণ নেই। সমস্ত দিনের শেষে নিঃশব্দে আঁধারের আগমন ঘটছে, চিল অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছে, পৃথিবীর সব রঙ নিভে যাচ্ছে, জোনাকির ঝিলমিল রঙে তখন লেখক-শিল্পীরা গল্পের আয়োজন করছেন। দিনের শেষে ঘরে ফেরার পালা—সব পাখি ঘরে ফেরে—সব নদীও, জীবনের বিকিকিনি শেষ হয়—কবিও চুকিয়ে দেন বেচাকেনা, মিটিয়ে দেন লেনাদেনা। দিনের বিশাল আয়োজন এবং যাবতীয় কর্মকাণ্ডের অবসান হলেও কিন্তু সবকিছু শেষ হয়ে যায় না :—জোনাকির রঙে ঝিলমিল গল্পের আয়োজন পৃথিবীর সব রঙ নিভে গেলেই তো হয়। আর থাকে অন্ধকার এবং সে অন্ধকারে 'মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন'। কিন্তু 'সমস্ত দিনের' আলোর লগ্নে তাঁরা কোথায় ছিলেন? এ রহস্যের কোন সমাধান কবি দেন নি। নাকি তাদের শৈল্পিক ভুবনে অন্ধকার চিরবিরাজমান।

৩

জীবনানন্দ *বনলতা সেন* গ্রন্থের আরও একটি কবিতায় বনলতা সেন সম্পর্কে আমাদের অবহিত করেছেন। 'হাজার বছর শুধু খেলা করে' শিরোনামের এই কবিতাটি উল্লেখযোগ্য :

> হাজার বছর শুধু খেলা করে অন্ধকারে জোনাকির মতো :
> চারিদিকে চিরদিন রাত্রির নিধান;
> বালির উপরে জ্যোৎস্না—দেবদারু ছায়া ইতস্তত
> বিচূর্ণ ঘাসের মতো : দ্বারকার;—দাঁড়ায়ে রয়েছে মৃত, ম্লান।
> শরীরে ঘুমের ঘ্রাণ আমাদের—ঘুচে গেছে জীবনের সব লেনদেন;
> 'মনে আছে'? শুধাল সে—শুধালাম আমি শুধু 'বনলতা সেন'?

হাজার বছরের পথ হাঁটা এখন স্মৃতি। বনলতা সেনের সঙ্গে এটি কবির দ্বিতীয় সাক্ষাৎ। এর আগেও বনলতা সেনই কবিকে প্রশ্ন করেছিল 'এতদিন কোথায় ছিলেন'? আবার দেখা

হবার পর বনলতা সেনই প্রশ্ন করছে 'মনে আছে'? কবি কিছুটা বিস্ময়ভরা আনন্দের সঙ্গে নিশ্চিত করলেন 'বনলতা সেন'? লক্ষণীয় যে, এই কবিতাটির পঙ্‌ক্তি সংখ্যা ছয়, বনলতা সেনের একেকটি স্তবকের সমান।

এর আগে *রূপসী বাংলা* গ্রন্থের 'পৃথিবীর পথে আমি' শিরোনামের সনেটটিতে কবি পাঠকদের জানিয়েছিলেন—'পৃথিবীর পথে আমি বহুদিন বাস ক'রে হৃদয়ের নরম কাতর/ অনেক নিভৃত কথা জানিয়াছি;—পৃথিবীতে আমি বহুদিন কাটায়েছি'। 'হাজার বছর ধরে...পৃথিবীর পথে' হাঁটার আগে তিনি পৃথিবীর পথে বহুদিন বাস করেছেন এবং 'পৃথিবীতে...বহুদিন' কাটিয়েছেন; জেনেছেন ভালবাসার কথা, হৃদয়ের করুণ আর্তির কথা এবং ক্লান্তশ্রান্ত হবার কথাও।

বনলতা সেন কবিচিত্তকে যে আচ্ছন্ন করেছিল তা আরও তিনটি কবিতায় প্রকটিত। অসম স্তবকের এই তিনটি কবিতার প্রথমটির শেষ স্তবক বনলতা সেনকে নিবেদিত :

বাঙালি পাঞ্জাবী মারাঠি গুজরাটি

... ...
বনলতা সেন, তুমি যখন নদীর ঘাটে স্নান করে ফিরে এলে
মাথার উপরে জ্বলন্ত সূর্য তোমার,
অসংখ্য চিল, বেগুনের ফুলের মত রঙিন আকাশের পর আকাশ
তখন থেকেই বুঝেছি আমরা মরি না কোনোদিন
কোনো প্রেম কোনো স্বপ্ন কোনোদিন মৃত হয় না
আমরা পথ থেকে পথ চলি শুধু—ধূসর বছর থেকে ধূসর বছরে—
আমরা পাশাপাশি হাঁটতে থাকি শুধু, মুখোমুখি দাঁড়াই :
তুমি আর আমি,
কখনো বা বেবিলনের সিংহের মূর্তির কাছে
কখনো বা পিরামিডের স্তব্ধতায়
কাঁখে তোমার মাদকতাময় মিশরীয় কলসী
নীল জলের গহন রহস্যে ভয়াবহ
মাথার উপর সকালের জ্বলন্ত সূর্য তোমার, অসংখ্য চিল,
বেগুন ফুলের মত রঙিন আকাশের পর আকাশ।

এই বনলতা সেন আলোর। নিরালোকে দিব্যদৃষ্টিতে দেখার বনলতা এ নয়। কিন্তু এই 'সকালের জ্বলন্ত' সূর্যের নিচের বনলতা সেনকে নিয়ে হাজার বছর পথ হাঁটার কথা বলেন কবি, অমরতার কথা বলেন, প্রেম এবং স্বপ্নের অমরতার কথাও বলেন। পাশাপাশি হাঁটার কথাও বলেন : 'আমরা পথ থেকে পথ চলি শুধু—ধূসর বছর থেকে ধূসর বছরে—/ আমরা পাশাপাশি হাঁটতে থাকি শুধু'। দিনের আলোয় দেখা বনলতা সেনের রূপের কোন বর্ণনা দেননি কবি। 'মাথার উপরে জ্বলন্ত সূর্য' কি এখানে তার রূপের প্রতীক? কবি রহস্যময়তার আবরণে বনলতা সেনকে আবৃত রাখেন। দ্বিতীয় কবিতাটি হলো—

একটি পুরোনো কবিতা
আমরা মৃত্যু থেকে জেগে উঠে দেখি
চারিদিকে ছায়াভরা ভিড়
কুলোর বাতাসে উড়ে ক্ষুদের মতন
পেয়ে যায়—পেয়ে যায়—অণুপরমাণুর শরীর
একটি কি দুটো মুখ—তাদের ভিতরে
যদিও দেখিনি আমি কোনো দিন—তবুও বাতাসে

প্রথম গার্গীর মত—জানকীর মত হয়ে ক্রমে
অবশেষে বনলতা সেন হয়ে আসে।

তৃতীয় কবিতাটিও আগ্রহোদ্দীপক এবং প্রথম *বনলতা সেন*-এর সঙ্গে এর সংশ্লিষ্টতা আছে :

শেষ হ'ল জীবনের সব লেনদেন
শেষ হ'ল জীবনের সব লেনদেন,
বনলতা সেন।
কোথায় গিয়েছ তুমি আজ এই বেলা
মাছরাঙা ভোলেনি তো দুপুরের খেলা
শালিখ করে না তার নীড় অবহেলা
উচ্ছ্বাসে নদীর ঢেউ হয়েছে সফেন,
তুমি নাই বনলতা সেন।
তোমার মতন কেউ ছিল কি কোথাও?
কেন যে সবের আগে তুমি চলে যাও।
কেন যে সবের আগে তুমি
পৃথিবীকে করে গেলে শূন্য মরুভূমি
(কেন যে সবার আগে তুমি)
ছিঁড়ে গেলে কুহকের ঝিলমিল টানা ও পোড়েন,
কবেকার বনলতা সেন।
কত যে আসবে সন্ধ্যা প্রান্তরে আকাশে,
কত যে ঘুমিয়ে রবো বস্তির পাশে,
কত যে চমকে জেগে উঠবো বাতাসে,
হিজল জামের বনে থেমেছে স্টেশনে বুঝি রাত্রির ট্রেন,
নিশুথির বনলতা সেন।

বনলতা সেনকে নিয়ে কবির ভাবনার বিবর্তন লক্ষণীয়। পরের চারটি কবিতার কোনটিই শৈল্পিক মানে প্রথম কবিতাটির কাছাকাছিও পৌঁছতে পারে নি। যে নান্দনিক ঐশ্বর্য প্রথম কবিতাটিকে অনুপম করেছে, পরেরগুলিতে তা অনুপস্থিত। কবির অনুপ্রেরণার গভীরতা, ব্যাপকতা, নান্দনিক স্পর্শকাতরতা, আবেগজ তাড়না এবং বিভিন্ন কাব্যিক উপাদানের সুসমন্বিত উপস্থাপনার বিষয়টিও এখানে উল্লেখ্য। তবে আরেকটি উল্লেখ্য বিষয় হলো 'নাটোর'-এর অনুপস্থিতি। প্রশ্ন জাগে—'এ বনলতা সেন কোথাকার এবং কে'? প্রশ্নের উত্তরও আমরা পেয়ে যাই সহজে : কবি এখন নিরেট বাস্তবতার—এই কর্মকোলাহলমুখর পৃথিবীর রোমান্টিক মায়ামুগ্ধতাহীন সমাজসচেতন দায়বদ্ধ একজন মানুষ। কিন্তু করুণ আর্তির হৃদয়-বিদারী হাহাকারে বিপর্যস্ত তিনি। এবার সত্যি সত্যি জীবনের সব লেনদেন ফুরিয়েছে। মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন 'পৃথিবীকে শূন্য মরুভূমি' করে সবার আগে চলে গেছে কবিকে রিক্ততার অসহায়তায় একাকী রেখে : 'কেন যে সবের আগে তুমি চলে যাও'। 'কুহকের ঝিলমিল' এখন ছিন্নভিন্ন। যে আলোকিত অন্ধকারে বনলতা সেন অলোকসামান্য রূপ নিয়ে কবির প্রতীক্ষা করত সে আর নেই। পৃথিবী তেমনি আছে—মাছারাঙা খেলা করে, শালিখ নীড়ে যাওয়া আসা করে, নদীতে ফেনিল উচ্ছ্বাসে ঢেউ উঠে পড়ে : কিন্তু 'তুমি নাই বনলতা সেন'। যৌবনের অদম্য স্বপ্নময়তার অবসান হয়েছে। অভাব আর অনটন ভরা বস্তির পাশে কবির ঘুমের স্থান। তবু শিল্পী যে, জেগে উঠে বনলতা সেনের কথাই মনে পড়বে। বাঁধন—স্মৃতির বাঁধন—বুঝি বা ছিন্ন হবার নয়। 'কোনো প্রেম কোনো স্বপ্ন কোনোদিন মৃত হয় না'।

বনলতা সেনের ক্রমপরিবর্তনের ইতিহাস, অন্ধকার থেকে দুপুরে তার আবির্ভাবের ইতিহাস, তার অন্তর্ধানের ইতিহাস, কবির—শিল্পীর—জীবনে সৌন্দর্যের একনিষ্ঠ সাধনার ইতিহাসের এক ধরনের পরিসমাপ্তির ইতিহাস। না, বিদিশার নিশার মত চুলকে, শ্রাবস্তীর কারুকার্যের মত মুখকে, সবুজ ঘাসের দেশের মত দেহবল্লরীকে এবং পাখির নীড়ের মত চোখকে পরিকল্পিত আলোকপাতের দুর্ঘটনায় বিবর্ণ-ম্লান হতে দেননি। লেনদেন ফুরিয়ে যাবার কথা প্রথমেই বলে রেখেছেন—সতর্কবাণীর অসহায় উচ্চারণ আগেই করেছেন, ১০ নং মহাবিপদসঙ্কেত আগেই উত্তোলন করেছেন; তারপরও আশ্বাসের অনিন্দ্য বীণা বেজেছিল—'থাকে শুধু অন্ধকার' আর থাকে 'মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন'। এখন সে বীণার তার ছিঁড়ে গেছে। কবি নিয়েছেন স্বর্গ হতে বিদায়—

কত যে আসবে সন্ধ্যা প্রান্তরে আকাশে
কত যে ঘুমিয়ে রবো বস্তির পাশে।

কবির নান্দনিক সৌন্দর্যের মগ্নচৈতন্যের কল্পলোক এখন বিচূর্ণ। Tennyson-এর 'The Palace of Art' কবিতায় শিল্পীর 'soul' জীবনের মানে খুঁজে পেয়েছিল একটি 'cottage in the vale'-এ। সাধারণ মানুষের জীবনের সান্নিধ্যে। জীবনানন্দ স্বপ্নলোক ছেড়ে নেমে এসেছেন বস্তির পাশে। 'The Palace of Art'-এর কথা এখানে মনে পড়লেও এই কবিতাটির অন্তর্নিহিত দর্শন জীবনানন্দের উপজীব্য নয়। কিন্তু এই মিলটুকু তাৎপর্যপূর্ণ। 'বনলতা সেন' সম্পর্কিত কবিতাগুচ্ছে তিনি শিল্পীর বিচ্ছিন্নতা এবং শিল্পের জন্য শিল্প, নাকি সবার জন্য শিল্প—এসব তত্ত্ব নিয়ে মাথা ঘামান নি। কিন্তু চিরন্তন পথিক-নাবিক যে বললেন 'কত যে ঘুমিয়ে রবো বস্তির পাশে', এর একটা বিশেষ তাৎপর্য তো আছেই—অপার সৌন্দর্যলোক থেকে নেমে আসলেন জীবনের রূঢ় বাস্তবায়।

এই কবিতাগুচ্ছ যে একগ্রন্থিভুক্ত তা শুধু বনলতা সেনের নামই প্রমাণ করে না, আরও কতগুলি তাৎপর্যপূর্ণ শব্দের পুনর্ব্যবহার তা নিশ্চিত করে—যেমন : অন্ধকার, জোনাকি, জীবনের লেনদেন, পথ থেকে পথ চলা—হাজার বছর ধরে পথ হাঁটার দ্যোতনা, ধূসর, কবেকার, ঝিলমিল। সর্বোপরি দয়িতা বনলতা সেনের প্রতি প্রেম ও আবেগের বিরতিহীন অন্তঃস্রোত। যে ঘটনাপ্রবাহ, জীবনের যে ঘূর্ণাবর্ত, যন্ত্রণার যে নীল প্রবাহ কবি এবং বনলতা সেনের এ পরিণতির জন্য দায়ী, তার কথা ভেবে পাঠকেরা বিচলিত হবে বৈকি।

৪

জীবনানন্দের কবিতার সবচেয়ে নন্দিত এই নায়িকা—বনলতা সেন—বাস্তবের কোন অধরা, কোন নিরুপমা, নারী ছিল নাকি কল্পলোকের বা অবচেতনের কোন চির-অনন্য নারী—এ প্রশ্ন পাঠকচিত্তকে সততই আন্দোলিত করেছে। জীবনানন্দ তাকে নাটোরের ভৌগোলিক অবস্থানে স্থাপন করে জল্পনা-কল্পনার যে শুধু উন্মেষ ঘটিয়েছেন তা-ই নয়, জল্পনা-কল্পনাকে ঘনীভূতও করেছেন। তার নিজের আরও তিনটি কবিতা ছাড়া অন্য কোথাও বনলতা সেনের আর কোন উল্লেখ না থাকায় বহুদিন ধরে জীবনানন্দ ভক্ত এবং সমালোচকেরা ভেবেছেন যে বনলতা সেন কল্পনার রহস্যালোকের এক অনুপম নাগরিক। কিন্তু রহস্যের কিছুটা হলেও উন্মোচনের সূত্রপাত হয় আশির দশকের মাঝামাঝি *জীবনানন্দ সমগ্র* তৃতীয় খণ্ডে (প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৭০০০১৩, ১৯৮৬) অন্তর্ভুক্ত জীবনানন্দের *কারুবাসনা* শিরোনামের আত্মজৈবনিক উপন্যাসে বনলতা সেন সম্পর্কিত আলোকপ্রদ উল্লেখে। পাঠকেরা প্রথম জানতে পারেন যে হয়ত বনলতা সেন নামের যথার্থই কেউ ছিল যে অনুরাগের রামধনু নিয়ে সাজিয়ে ছিল কবির মানসাকাশ।

হৃদয়ে আঙিনায় এঁকেছিল ভালবাসার আল্পনা। এবং ধীরে ধীরে এক সময়ে অভিষিক্ত হয় মানসসুন্দরীর প্রতীকী মর্যাদায়। সাধারণ অর্জন করে অসাধারণত্ব। সামান্যের উত্তরণ ঘটে অসামান্যে। *কারুবাসনা*-র নায়ক জানায় :

> চারিদিকে তাকিয়ে দেখি শুধু মৌসুমির কাজলঢালা ছায়া। কিশোরবেলায় যে কাল মেয়েটিকে ভালবেসেছিলাম কোন এক বসন্তের ভোরে, বিশ বছর আগে যে আমাদেরই আঙিনার নিকটবর্তিনী ছিল, বহু দিন যাকে হারিয়েছি– আজ, সে-ই যেন, পূর্ণ যৌবনে উত্তর আকাশের দিগঙ্গনা সেজে এসেছে। দক্ষিণ আকাশের সে-ই যেন দিগবালিকা, পশ্চিম আকাশেও সে-ই বিগত জীবনের কৃষ্ণা মণি, পুব আকাশে আকাশ ঘিরে তারই নিটোল কাল মুখ। নক্ষত্রমাখা রাত্রির কাল দিঘির জলে চিতল হরিণীর প্রতিবিম্বের মত রূপ তার– প্রিয় পরিত্যক্ত মৌনমুখী চমরীর মত অপরূপ রূপ। মিষ্টি ক্লান্ত অশ্রুমাখা চোখ, নগ্ন শীতল নিবারণ দু'খানা হাত, ম্লান ঠোঁট, পৃথিবীর নবীন জীবন ও নবলোকের হাতে প্রেম বিচ্ছেদ ও বেদনার সেই পুরোন পল্লীর দিনগুলো সমর্পণ করে কোন দূর নিঃস্বাদ নিঃসূর্য অভিমানহীন মৃত্যুর উদ্দেশ্যে তার যাত্রা।
>
> সেই বনলতা—আমাদের পাশের বাড়িতে থাকত সে। কুড়ি-বাইশ বছরের আগের সে এক পৃথিবীতে; বাবার তার লম্বা চেহারা, মাঝা-গড়নের মানুষ– শাদা দাড়ি, স্নিগ্ধ মুসলমান ফকিরের মত দেখতে, বহু দিন হয় তিনিও এ পৃথিবীতে নেই আর; কত শীতের ভোরের কুয়াশা ও রোদের সঙ্গে জড়িত সেই খড়ের ঘরখানাও নেই তাদের আজ। বছর পনের আগে দেখেছি *(পৃ. ৩৯)* মানুষজন নেই, থমথমে দৃশ্য, লেবু ফুল ফোটে, ঝরে যায়, হোগলার বেড়াগুলো উইয়ে খেয়ে ফেলেছে। চালের উপর হেমন্তের বিকেলে শালিখ আর দাঁড়কাক এসে উদ্দেশ্যহীন কলরব করে। গভীর রাতে জ্যোৎস্নায় লক্ষ্মীপেঁচা ঝুপ করে উড়ে আসে। খানিকটা খড় আর ধুলো ছড়িয়ে যায়। উঠানের ধূসর মুখ জ্যোৎস্নার ভিতর দু-তিন মুহূর্তে ছটফট করে। তার পরেই বনধুঁধুল, মাকাল, বইচি ও হাতিশুঁড়ার অবগুণ্ঠনের ভিতর নিজেকে হারিয়ে ফেলে।
>
> বছর আষ্টেক আগে বনলতা একবার এসেছিল। দক্ষিণের ঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে চালের বাতায় হাত দিয়ে মা ও পিসিমার সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বললে সে। তারপর আঁচলে ঠোঁট ঢেকে আমার ঘরের দিকেই আসছিল। কিন্তু কেন যেন অন্যমনস্ক নত মুখে মাঝপথে গেল থেমে, তারপর খিড়কির পুকুরের কিনারা দিয়ে, শামুক-গুগলি পায়ে মাড়িয়ে, বাঁশের জঙ্গলের ছায়ার ভিতর দিয়ে চলে গেল সে। নিবিড় জামরুল গাছটার নিচে একবার দাঁড়াল, তারপর পৌষের অন্ধকারের ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল।
>
> তারপর তাকে আর আমি দেখিনি।
>
> অনেক দিন পরে আজ আবার সে এল; মনপবনের নৌকায় চড়ে, নীলাম্বরী শাড়ি পরে, চিকন চুল ঝাড়তে ঝাড়তে আবার সে এসে দাঁড়িয়েছে; মিষ্টি অশ্রুমাখা চোখ, ঠাণ্ডা নির্জন দু'খানা হাত, ম্লান ঠোঁট, শাড়ির ম্লানিমা। সময় থেকে সময়ান্তর, নিরবচ্ছিন্ন, হায় প্রকৃতি, অন্ধকারে তার যাত্রা।— *(পৃ. ৪০)*
>
> —'বহু দিন কলকাতা দেখি না, কে কোথায় বলতে পারো?'
>
> —'না তো'
>
> —আর বনলতার বাবা সেই কেদারবাবু—আচ্ছা এমন বন্ধু কি মানুষের এক জীবনের তপস্যায় জোটে? চল্লিশটা বছর পাশাপাশি আমরা কাটালাম। লম্বা-চওড়া চেহারা, মাটির মত মন, কত ক্ষণে-অক্ষণে আমার কাছে এসে বসেছেন। এমনি বৃষ্টির রাতেও কত গভীর রাত পর্যন্ত মুখোমুখি বসে আমরা আলাপ করেছি কিংবা চুপচাপ বসে রয়েছি।'

একটু চুপ থেকে—'আর বনলতা?' আমার দিকে তাকিয়ে, 'মনে হয় তার কথা তোমার?'

কোনো উত্তর দিলাম না।

—'না। ভুলেই গেছ হয়ত।'

খানিকক্ষণ নিস্তব্ধতার পর বললেন, 'কিন্তু'। কিন্তু, এই বলেই চুপ করলেন– কথাটা বাবা আর শেষ করলেন না। *(পৃ. ৫৪)*

বনলতার কথা মনে হয়—এমনি শান্ত ধূসর শ্রাবণের শেষ রাতে সেও কি কোনো দূর দেশে তার স্বামীর ঘরের জানলার ভিতর দিয়ে কোনো প্রান্তরের চিতার দিকে তাকিয়ে আমার কথা ভাবছে এমন করে?

আমি যদি যক্ষ্মায় বিছানা নি, সে যদি খবর পায়, এমনি করে সে ও কি শিয়রের পাশে বসে থাকবার জন্য চলে আসবে?

না, তা আসবে না, এমন কোনো নারী নেই যে তার মৃত্যুশয্যা থেকে আমার সান্নিধ্য আকাঙ্ক্ষা করবে। *(পৃ. ১১০)*

দেখা যাচ্ছে যে 'বনলতা' নামটির সঙ্গে কবির নিবিড় পরিচয় ছিল। তার উপন্যাসের নায়ক তাকে 'কোন এক বসন্তের ভোরে' ভালবেসেছিল। বনলতার বাবা এবং তাদের ঘরবাড়ির চিত্রল বর্ণনা থেকে মনে হয় কবি এসব নিয়ে বেশ ভেবেছেন। বনলতার রূপের হৃদয়স্পর্শী বর্ণনা থেকে এ ধারণা করা যায় যে শুধু উপন্যাসের নায়কই নন, কবি নিজেও বনলতার রূপমুগ্ধ হয়েছিলেন। বনলতা সেনের রূপের বর্ণনার সঙ্গে মিল না থাকলেও বনলতার রূপের বর্ণনাও শৈল্পিক সৌকর্যে ভাস্বর, বৈচিত্র্যমণ্ডিত উপমার ব্যবহারে অনন্য এবং জীবনানন্দের চিত্ররূপময় চেতনার স্পষ্টতায় মনোমুগ্ধকর : 'নক্ষত্রমাখা রাত্রির কাল দিঘির জলে চিতল হরিণীর প্রতিবিম্বের মত রূপ তার—প্রিয় পরিত্যক্ত মৌনমুখী চমরীর মত অপরূপ রূপ।' বনলতা 'বিগত জীবনের কৃষ্ণামণি'। 'বিশ বছর' ও 'কুড়ি-বাইশ' বছর 'বনলতা সেন'-এ হয়েছে 'হাজার বছর।' বনলতা যে শুধু কালো তা-ই নয়, বনলতার যাত্রা অন্ধকারে 'অভিমানহীন মৃত্যুর উদ্দেশ্যে'; 'সময়ান্তর, ...অন্ধকারে তার যাত্রা।' *বনলতা সেন*-এর বনলতা সেন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অন্ধকারেই থেকে যায়, *কারুবাসনার* বনলতার মত তাকে কখনো আলোতে দেখা যায় না। কাব্যভুবনে কবি বনলতার ব্যাপক এবং সুদূরপ্রাসারী শৈল্পিক রূপান্তর ঘটান : উপন্যাসের বনলতাকে অভিষিক্ত করেন 'সেন' পদবির মর্যাদায় : অবচেতনের রহস্যালোকের অন্ধকারে প্রতিষ্ঠিত করে তাকে অনন্ত কৌতূহলের বিষয় করে তোলেন। নাটোরে ঠিকানা নির্ধারিত করে তাকে নিয়ে আসেন চেনা ভুবনের নিবিড় অন্তরঙ্গতায়। কিন্তু তবু তাকে আলোকরশ্মিপাতে উদ্ভাসিত করা থেকে বিরত থাকেন যাতে পাঠকেরা কল্পনার তুলি দিয়ে নিজের মত করে বনলতা সেনের ছবি আঁকতে পারে। *কারুবাসনার* বনলতার বর্ণনা প্রায় পুঙ্খানুপুঙ্খ, কিন্তু বনলতা সেনের বর্ণনা বাস্তবরূপ এবং পরাবাস্তবরূপবাদী তথা সাবলাইম-তুলির কয়েকটি উদ্দীপকভাবে অস্পষ্ট টানে সমৃদ্ধ। সে যা-ই হোক, বনলতা সেনকে প্রায় দ্বিধাহীনচিত্তেই বনলতার উত্তরসূরি হিসেবে অভিহিত করা যেতে পারে। কবির আপনভুবন থেকেই যেন তার অভ্যুদয় এবং অন্তর্জগতের অমেয় তিমিরে তার অধিষ্ঠান।

৫

একবার বুদ্ধদেব বসু আর একবার দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের অনুরোধে জীবনানন্দ অন্যান্য কবিতার সঙ্গে বনলতা সেন কবিতাটি নিজেই ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলেন। তাঁর একটি অনুবাদ নিম্নরূপ :

Banalata Sen

Long I have been a wanderer of this world,
many a night,
My route lay across the sea of Ceylon somewhat winding to
The seas of Malaya.
I was in the dim world of Bimbisar and Asok, and further off
In the mistiness of Vidarbha.
At moments when life was too much a sea of sounds,
I had Banalata Sen of Natore and her wisdom.

I remember her hair dark as night at Vidisha,
Her face an image of Sravesti as the pilot,
Undone in the blue milieu of the sea,
Never twice saw the earth of grass before him,
I have seen her, Banalata Sen of Natore.

When day is done, no fall somewhere but of dews
Dips into the dusk; the smell of the sun is gone
Off the Kestrel's wings. Light is your wit now,
Fanning Fireflies that pitch the wide things around
For Banalata Sen of Natore.

অনুবাদ কখনো মূলের মত হয় না, এ কথা সত্য। ভাবগত বা শৈল্পিক প্রয়োজনে অনুবাদককে অনেক সময় স্বাধীনতা অবলম্বন করতে হয় এবং তিনি কোন কোন ক্ষেত্রে মূল থেকে সরে যান। জীবনানন্দও তাই করেছেন। তবে অনেক পাঠকেরই হয়ত মনে হবে যে অনুবাদক হিসেবে তিনি ততটা সাফল্যের পরিচয় দিতে পারেন নি। যেমন বনলতা সেনের দ্বিতীয় লাইনের 'নিশীথের অন্ধকারে'র তিনি অনুবাদ করেছেন Many a night! Night বলতে সব সময়ে নিশীথের অন্ধকার তো নয়ই, অন্ধকার রাতও বুঝায় না। 'মালয় সাগরে অনেক ঘুরেছি আমি'র অনুবাদ নিশ্চয়ই somewhat winding to/The seas of Malaya নয়। 'সফেন সমুদ্র' কি 'sea of sounds'? '...image of Sravasti' কি শ্রাবস্তীর কারুকার্য বুঝায়? 'আমি ক্লান্ত প্রাণ এক' হিশেব থেকে মনে হচ্ছে বাদই পড়ে গেছে। 'I had Banalata Sen of Natore and her wisdom' 'আমারে দুদণ্ড শান্তি দিয়েছিল নাটোরের বনলতা সেন' থেকে বহু দূরে। ক্লান্ত প্রাণের শান্ত হওয়ার সংবেদনশীলতা কোথায় উবে গেছে। এভাবেই দেখা যায় যে, 'সবুজ ঘাসের দেশ যখন সে চোখে দেখে দারুচিনি দ্বীপের ভিতর,/তেমনি দেখেছি তারে অন্ধকারে; বলেছে সে, 'এতদিন কোথায় ছিলেন'?/পাখির নীড়ের মত চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন'—হারিয়ে গেছে অনুবাদে, যেখানে আমরা পাচ্ছি—

Never twice saw the earth of grass before him,
I have seen her, Banalata Sen of Natore.

একইভাবে দেখা যায় যে শেষ স্তবকের ভাবব্যঞ্জনা, গভীর আবেগ-অনুভব এবং চিত্রকল্প সব হারিয়ে গেছে অনুবাদে। শেষ লাইনটার কথাই ধরা যাক—'থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন' 'For Banalata Sen of Natore'-এ কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। অনুবাদটিকে অনুবাদ হিশেবে বিবেচনা না করে আলাদা একটি ইংরেজি কবিতা হিশেবে বিবেচনা করলে হয়ত পার পাওয়া যাবে। অনুবাদ হিশেবে

বিবেচনা করলে বলতেই হবে যে অনুবাদে মূল বনলতা সেনকে খুঁজে পাওয়া বেশ কঠিন। অনুবাদটিকে ব্যর্থ বললে হয়ত অত্যুক্তি হবে না।

৬

বনলতা সেন কবিতায় অন্ধকার একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। অন্ধকার এখানে উদ্দীপক এবং অপার রহস্যময়তা সৃষ্টি করে কল্পনাকে সক্রিয় করে তোলে। কবি নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে অনেক ঘুরেছেন। অন্ধকারে বিদর্ভ-নগরে ছিলেন। বনলতা সেনের চুল অন্ধকার বিদিশার নিশার মত কালো। দারুচিনি-দ্বীপের ভিতর সবুজ ঘাসের দেশ-এর মত তাকে দেখেছেন অন্ধকারে। 'সমস্ত দিনের শেষে' 'থাকে শুধু অন্ধকার', মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন'। হাজার বছর আগে যে যাত্রার শুরু তার শেষে চির-আরাধ্য দয়িতার সঙ্গে অন্ধকারেই মুখোমুখি বসতে হয়। জীবনের সব লেনদেন শেষ হলেও প্রেম থেকে যায়, থেকে যায় আদর্শায়িত প্রেমিকার স্বপ্ন, অন্ধকারে যে জ্বলে ওঠে এবং দীপ্ত হয় প্রেমিকের চোখে। যে প্রেমিকের রয়েছে দিব্যদৃষ্টি, অন্ধকার-বিদারী দৃষ্টি—যাতে প্রেমিকার অবয়ব অন্ধকারেও মূর্ত হয়ে ওঠে। 'মৃত্যুর আগে' কবিতাতেও অন্ধকারের ভূমিকা দেখা যায়– 'পৃথিবীর সেই কন্যা কাছে এসে অন্ধকারে নদীদের কথা কয়ে গেছে'। 'সেই কন্যা'—যার জন্য দীর্ঘ প্রতীক্ষা, অন্ধকারেই তার আবির্ভাব। এই কবিতাতেই জীবনানন্দ 'আরো এক আলো'র কথা বলেন—'আমরা বুঝেছি যারা পথ ঘাট মাঠের ভিতর/আরো এক আলো আছে।' এই আলোর জন্যই কি কবি অন্ধকারেও দেখতে পান? 'বনলতা সেন'-এ অবশ্য কবি কোন আলোর কথা বলেন নি, বলেছেন জোনাকির রঙের কথা। জোনাকির আলো অন্ধকারকে আরও প্রগাঢ় করে। কবি যে অন্ধকারে দেখতে পান তা নিয়ে কোন দ্বিধা নেই—বনলতা সেনের শরীর যে 'সবুজ ঘাসের দেশ'-এর মত তা তিনি অন্ধকারেই দেখেছেন। আর বনলতা সেনের মুখোমুখিও বসছেন অন্ধকারে। অন্ধকারেও দেখছেন বলেই—উপলব্ধি করতে পারছেন বলেই—মুখোমুখি যে তা বুঝতে পারছেন।

৭

অতীতচারিতা এবং অতীত সংশ্লিষ্টতা জীবনানন্দের কাব্যিক ঐতিহ্যের একটি অন্তর্গত মহাগুণ। অতীতের বিষয়াদির ব্যঞ্জনা কবিতাকে সরস, সমৃদ্ধ এবং হৃদয়গ্রাহী করেছে। দান করেছে বহুমাত্রিকতা। বনলতা সেন কবিতাতে রয়েছে এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত : বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগত, অন্ধকার বিদর্ভ নগর, বিদিশার নিশা, শ্রাবস্তীর কারুকার্য পাঠকদের নিয়ে যায় এক স্বপ্ন-কল্পলোকে, যেখানে একদিন এ সবই সত্য ছিল, এবং কবির কল্পতুলির স্পর্শে যা এখন কবিতার ক্যানভাসে সজীব ও সপ্রাণ এবং রোমাঞ্চকর অনুভূতির অফুরন্ত উৎস। এসব উচ্চারণ পাঠকদের সম্মোহিত করে। একটি স্বপ্নলোকের সৃষ্টি করে অপ্রতিরোধ্যভাবে পাঠকদের সেখানে নিয়ে যায়। প্রসঙ্গের কিছুটা পরিবর্তন করে বলা যায় এ ধরনের ঐতিহাসিক নামের ব্যবহারে জীবনানন্দের 'historical sense' বিধৃত। Eliot-এর এই সংজ্ঞার অন্তর্গত হচ্ছে 'perception, not only of the pastness of the past, but of its presence' (Tradition and Individual Talent)। জীবনানন্দের অনুভবের যাদুস্পর্শে অতীতের এইসব নাম অভূতপূর্বভাবে বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে। এ প্রসঙ্গে Eliot-এর এই নিবন্ধ থেকে আরেকটা উদ্ধৃতি দেয়া যেতে পারে—'the difference between the present and the past is that the conscious present is an awareness of the past in a way and to an extent which the past's awareness of itself cannot

show'—জীবনানন্দে আমরা পাচ্ছি এই 'conscious present'-কে। বনলতা সেন গ্রন্থের আরও অনেক কবিতায় এ ধরনের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় :

জ্যোৎস্নারাতে বেবিলনের রানীর ঘাড়ের উপর...
যে রূপসীদের আমি এশিরিয়ায়, মিশরে, বিদিশায় মরে যেতে দেখেছি

(হাওয়ার রাত— বনলতা সেন)

মনে হয় কোন বিলুপ্ত নগরীর কথা
সেই নগরীর এক ধূসর প্রাসাদের রূপ জাগে হৃদয়ে

(নগ্ন নির্জন হাত— বনলতা সেন)

গ্রীক হিন্দু ফিনিশিয় নিয়মের রূঢ় আয়োজন
শুনেছ ফেনিল শব্দে তিলোত্তমা-নগরীর গায়ে
কী চেয়েছে?...

(সুরঞ্জনা— বনলতা সেন)

...বেবিলনে একা একা এমনই হেঁটেছি আমি রাতের ভিতর
কেন যেন; আজো আমি জানি নাকো হাজার হাজার ব্যস্ত বছরের পর।

(পথ হাঁটা— বনলতা সেন)

'বনলতা সেন' সম্পর্কিত অন্যান্য কবিতায় এ ধরনের ব্যবহার কাঙ্ক্ষিত মাত্রিকতায় সমুজ্জ্বল : 'দেবদারু...বিচূর্ণ থামের মত : দ্বারকার', 'বেবিলনের সিংহের মূর্তির কাছে', 'পিরামিডের নিস্তব্ধতায়', 'মিশরীয় কলসী' এবং প্রথম 'গার্গীয় মতো—জানকীর মতো।' শেষ কবিতাটিতে এ ধরনের কোন ব্যঞ্জনা নেই। কবি এখানে নিরেট বর্তমানে : মাছরাঙা, শালিখ, নদী, মরুভূমি, সন্ধ্যার প্রান্তর, বস্তি, হিজল, জাম এবং স্টেশনে রাত্রির ট্রেনের ভুবনে—পর্যায়ক্রমে জাগতিক বাস্তবতার পরিচিত অন্তরঙ্গতায়। জীবনানন্দের এই অতীতচারিতা তার গভীর ইতিহাস সচেতনতার অমলিন স্বাক্ষর। তিনি 'carried the past into the present for the future'। এর ফলে তার কাব্যিক কল্পনার বিস্তার অনাদি অতীতের ভাবাবেগ-রঞ্জিত অনেক বিষয়-আশয়কে স্পর্শ করেছে এবং পাঠকদের কল্পনা ও আবেগের পরিধিকেও করেছে প্রসারিত। তিনি বনলতা সেনকে নাটোরের ভৌগোলিক অবস্থানে এবং সেন পদবির নির্দিষ্টতায় স্থাপন করে চেতনায় নতুন মাত্রা সংযোজন করেছেন।

এমনিভাবে অতীতকে বর্তমানে এনে নতুনভাবে গভীর ভাবের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে জীবনানন্দ অতীতকে শুধু নবজীবনই দান করেন নি, অপূর্ব কাব্যসুষমায় উদ্ভাসিত এবং সমৃদ্ধ করে নিজের কাব্যিক ভাবানুষঙ্গকে করেছেন সুদূরপ্রসারী এবং অনন্য তাৎপর্যে মণ্ডিত।

৮

'বনলতা সেন' কবিতাটি অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত। কিন্তু প্রতিটি ছয় পঙ্‌ক্তির স্তবক তিনটিতে কবি পর্ব বিভাগে সমতা রক্ষা করেন নি। প্রথম স্তবকে পর্ব বিভাগকে অভিহিত করা যায় নিয়মিত মহাপয়ারে—প্রতিটি পঙ্‌ক্তি তিন পর্বের ৮+৮+৬ মাত্রার। ৮ মাত্রার একটি পর্ব মাঝখানে থাকায় এটিকে বলা হয়েছে মহাপয়ার। দ্বিতীয় স্তবকে সম্ভবত ভাবাবেগের প্রাবল্যের এবং শেষ দু'পঙ্‌ক্তির নাটকীয়তার সঠিক রূপায়ণের জন্য কবি নিয়মকে ভেঙেচুরে উপযোগী ব্যতিক্রমের আশ্রয় নিয়েছেন, যার ফলে প্রথম স্তবকের সঙ্গে কোন সমতা বা সাযুজ্য রক্ষিত হয় নি, পর্ব এবং মাত্রার ক্ষেত্রে এক পঙ্‌ক্তির সঙ্গে আরেক পঙ্‌ক্তির কোন মিল নেই। যেমন :

প্রথম পঙ্‌ক্তি—৮+৮+২
দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তি—৪+৮+১০
তৃতীয় পঙ্‌ক্তি—৮+৬
চতুর্থ পঙ্‌ক্তি—৮+৮+১০
পঞ্চম পঙ্‌ক্তি—৮+৪+৪+১০
ষষ্ঠ পঙ্‌ক্তি—৮+৪+১০

তৃতীয় স্তবকেও কবি ভাবোপযোগী ব্যতিক্রমের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন এবং শেষ পঙ্‌ক্তি বাদ দিয়ে বাকি পাঁচ পঙ্‌ক্তিতে প্রথম এবং দ্বিতীয়—কোন পঙ্‌ক্তিরই পর্ব বিভাগ এবং মাত্রার সঙ্গে সঙ্গতি রাখেন নি। প্রথম স্তবকের পঙ্‌ক্তির মত এই স্তবকের শেষ পঙ্‌ক্তির পর্ব বিভাগ ও মাত্রা হলো ৮+৮+৬। বাকি পাঁচ পঙ্‌ক্তির পর্ব ও মাত্রা বিভাগ হলো :

প্রথম পঙ্‌ক্তি—৮+১০
দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তি—৪+৮+৬
তৃতীয় পঙ্‌ক্তি—৮+৪+১০
চতুর্থ পঙ্‌ক্তি—৮+১০
পঞ্চম পঙ্‌ক্তি-৮+৪+৮+৬

এই কবিতায় জীবনানন্দের অক্ষরবৃত্ত ছন্দের ব্যবহার মনে হয় নিরীক্ষামূলক এবং তার ব্যবহারনৈপুণ্যের আলোকে বলা যায় যে এতে তিনি সফল হয়েছেন এবং ভাব-তরঙ্গের সুনিয়ন্ত্রিত বিরতি ও প্রবহমানতার সাহায্যে সম্মোহন সৃষ্টিতে শৈল্পিক সৌকর্য অর্জন করেছেন। এই কবিতার তিনটি স্তবকের প্রত্যেকটির প্রথম চার পঙ্‌ক্তিতে রয়েছে একান্তর মিল এবং পরের দু'লাইন একটি শ্লোক।

এই কবিতায় জীবনানন্দ কয়েকটি কাব্যালঙ্কারের অত্যন্ত অভিভাবীয় ব্যবহার করেছেন। প্রথম পঙ্‌ক্তিতেই—'হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে'য় রয়েছে একটি অলঙ্কার—অতিশয়োক্তি বা hyperbole। এটি সুদূরপ্রসারী এবং যে ভাবাবেগ কবিকে অনাদি অতীত থেকে একজন পথিকে রূপান্তরিত করেছে তার প্রতি পাঠককে সচেতন এবং কল্পনাবিহারী করে। পাঠকেরা এই পথিকচিত্ততায় অভিভূত হয় এবং তাদের মনে এর কারণ সম্পর্কে প্রত্যাশা প্রবল হয়ে ওঠে। 'বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে' এবং 'অন্ধকারে বিদর্ভ নগরে' দুটি allusion বা ব্যঞ্জনা, যা পাঠকদের নিয়ে যায় সুদূর অতীতে এবং পথিকের অনন্তকাল আগে থেকে হাঁটার ব্যাপারটিকে যেন আরও প্রতিষ্ঠিত এবং জোরালো করে। 'জীবনের সমুদ্র সফেন' একটি metaphor বা রূপক, যা তরঙ্গাভিঘাতে ফেনিল সমুদ্রের সঙ্গে বেদনাভিঘাতে আর্ত জীবনের প্রচ্ছন্ন তুলনা ক'রে পাঠকদের নাবিকের অসহায়তা এবং অবসন্নতা ও বিক্ষত অবস্থা সম্পর্কে সচেতন করে। 'চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা' একটি রূপক, অভেদ কল্পনায় যা চুলের কালোত্বের সঙ্গে বিদিশার নিশার অন্ধকারের তুলনা করে পাঠকদের বোধকে সচেতন এবং সমৃদ্ধ করে। 'বিদিশা' একটি allusion বা ব্যঞ্জনার দৃষ্টান্ত। এই পঙ্‌ক্তিতে রয়েছে মধ্যমিলের গীতল ব্যবহার এবং 'আর'-এর অনুপ্রাস। 'মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য' একটি metaphor বা রূপক, যা মুখের সৌন্দর্যকে প্রচ্ছন্ন তুলনায় কল্পলোকে উদ্ভাসিত করে। 'অতিদূর সমুদ্রের 'পর/হাল ভেঙ্গে যে নাবিক হারায়েছে দিশা/সবুজ ঘাসের দেশ যখন সে চোখে দেখে দারুচিনি-দ্বীপের ভিতর,/তেমনি দেখেছি তারে অন্ধকারে' একটি মহাকাব্যিক

উপমা বা epic simile, যা কল্পনার, অনুভূতির ও ভাবাবেগের বিস্তৃতি ঘটায় এবং প্রত্যাশার ও স্বপ্নপূরণের পরিসমাপ্তিতে সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠে। 'পাখির নীড়ের মত চোখ' একটি গুণগত উপমা, যা নীড়ের যাবতীয় ভাবানুষঙ্গে চোখকে সমৃদ্ধ করে। 'শিশিরের শব্দের মতন/সন্ধ্যা আসে' একটি simile বা উপমা, যা সন্ধ্যায় নিঃশব্দ আগমনের ভাবকে গভীরতর করে। এই উপমার মধ্যে শব্দ-নৈঃশব্দের বিরোধাভাস রয়েছে। 'ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল'-কে একটি স্বভাবোক্তি অলঙ্কার হিসেবে অভিহিত করা যেতে পারে। 'পাণ্ডুলিপি' একটি metonymy বা লক্ষণালঙ্কারযুক্ত শব্দ, যা লেখকের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে।

৯

শিল্প ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ে ইউরোপে বিভিন্ন আন্দোলন হয়েছে, যেমন Impressionism (১৮৭৪), Expressionism (১৯০৫), Futurism (১৯০৯), Dadaism (১৯১৬), Surrealism (১৯২০) ইত্যাদি। এগুলোর মধ্যে বাংলাসাহিত্যে প্রভাববিস্তারকারী আন্দোলন হলো প্রধানত impressionism, expressionism এবং surrealism। জীবনানন্দের কাব্যেও এসব আন্দোলনের প্রভাব বেশ স্পষ্ট। তবে 'বনলতা সেন' কবিতায় surrealsim বা পরাবাস্তবতার এবং impressionism বা বাস্তবরূপবাদের প্রভাব পরিলক্ষিত হয় বেশি। Surrealsim-এর উদ্ভব dadaism থেকে। এর লক্ষ্য মনকে Logic এবং reason-এর প্রভাব থেকে মুক্ত করা। এই মতবাদ ফ্রয়েড দ্বারা খুবই প্রভাবিত। এর অনুসারীরা স্বপ্ন এবং অলীক বিশ্বাসের অভিঘাত বা ফলাফলের চর্চায় এবং সচেতন মনের দোরগোড়ায় নিদ্রিত এবং জাগ্রত অবস্থার ব্যাখ্যায়, সেই বিস্মৃত অবস্থার ব্যাখ্যায় যাতে মনের অনেক গভীরে অদ্ভুত সব বস্তু রূপধারণ করে, আগ্রহী ছিল। তারা চেয়েছিল মগ্নচৈতন্য বা অবচেতন ও চেতন এবং অন্তর্জগত ও বহির্জগতের মধ্যে যে সব অদৃশ্য দেয়াল আছে সেসব ভেঙে দিতে, যার ফলে অতিবাস্তবের রাজ্যে—অবচেতনের কল্পলোকের রাজ্যে—সবকিছু সম্ভব হয়। বাংলা কাব্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে জীবনানন্দ দাশকে surrealism-এর অগ্রপথিক বলা যেতে পারে। 'চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা' এবং 'মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য' চিত্রকল্প দুটি surrealism-এর দৃষ্টান্ত। 'শ্রাবস্তীর কারুকার্য' শব্দ দুটি নিরেট গদ্য। কিন্তু ব্যবহারের শৈল্পিক কুশলতায় এবং প্রসঙ্গের সুসমঞ্জস যথার্থতায় কাব্যিক লাবণ্যে এ দুটি হয়ে উঠেছে আবেদনঘন এবং ইঙ্গিতময়। Impressionists বা বাস্তবরূপবাদীদের মগ্নতা ছিল আলোর ক্ষণিকতার অভিঘাত নিয়ে এবং তারা চেয়েছিল ক্ষণস্থায়িত্বের এই বোধের মন্ময় আলেখ্য অঙ্কন করতে। উপস্থাপনার যাথার্থ্যের ব্যাপারে তাদের কোন আগ্রহ ছিল না। দর্শকের উপলব্ধির উপর নির্ভরশীল ছিল উদ্ভূত বোধ। 'তেমনি দেখেছি তারে অন্ধকারে', 'সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন/সন্ধ্যা আসে' এবং 'থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন' বাস্তবরূপবাদ বা impressionism-এর দৃষ্টান্ত। বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে surrealism বা পরাবাস্তবতা এবং impressionism বা বাস্তবরূপবাদ 'বনলতা সেন'-এর একটি মহিমান্বিত বা sublime কবিতা হওয়ার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। এখানে এটা উল্লেখ করা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে 'হাজার বছর ধরে... পৃথিবীর পথে হাঁটা', 'বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে' এবং 'দূর অন্ধকারে বিদর্ভ নগরে' থাকা মগ্নচৈতন্যেই সম্ভব। Logic এবং Reason এখানে কার্যকর নয়, আর অন্ধকারে দেখার ক্ষেত্রেও Logic এবং Reason সুষুপ্ত। কবি এই কবিতায় চেতনকে দাঁড় করিয়েছেন অবচেতনের দ্বারপ্রান্তে, বাস্তবকে কল্পলোকের।

'বনলতা সেন'-এর উপর বাংলা কবিতার প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে তাৎক্ষণিকভাবেই মনে পড়বে রবীন্দ্রনাথের *কল্পনা* কাব্যগ্রন্থের 'স্বপ্ন' শিরোনামের কবিতাটির কথা। এ কবিতাটি ছিল তাঁর অন্যতম প্রিয় কবিতা এবং তাঁর বিবেচনায় রবীন্দ্রনাথের একটি মহৎ সৃষ্টি (প্রবন্ধ : 'রবীন্দ্রনাথ')। এ প্রসঙ্গে তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতা' প্রবন্ধের একটি মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে : 'একজন শ্রেষ্ঠতম কবির কাব্যে তাঁর যুগ এমন মানবীয় পূর্ণতায় প্রতিফলিত হয় যে, সেই যুগের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত পথে যে-সব কবি নিজেদের ব্যক্ত করতে চান, ভাবে বা ভাষায়, কবিতার ইঙ্গিতে বা নিহিত অর্থে, সেই মহাকবিকে এড়িয়ে যাওয়া তাঁদের পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়।' প্রিয় কবিতাটি জীবনানন্দও যে এড়িয়ে যেতে পারেননি তা বলাই বাহুল্য। নিম্নে উল্লিখিত ইংরেজি এবং আমেরিকান কবিতা দুটির সঙ্গে 'স্বপ্ন' কবিতাটিও তার মানসসমৃদ্ধি ও কাব্যিক উপকরণের অমেয় আধারে অনন্য অবদান রেখেছে। 'স্বপ্ন' কবিতার প্রাসঙ্গিক অংশগুলি দেখা যাক :

স্বপ্ন
দূরে বহুদূরে
স্বপ্নলোকে উজ্জয়িনীপুরে
খুঁজিতে গেছিনু কবে শিপ্রা নদী পারে
মোরে পূর্ব জনমের প্রথমা প্রিয়ারে।
মুখে তার লোধ্ররেণু, লীলাপদ্ম হাতে,
কর্ণমূলে কুন্দকলি, কুরুবক মাথে,
... ...
প্রিয়ার ভবন
বঙ্কিম সঙ্কীর্ণ পথে দুর্গম নির্জন।
... ...
দেখা দিল দ্বারপ্রান্তে সোপানের 'পরে
সন্ধ্যার লক্ষ্মীর মতো সন্ধ্যাতারা করে।
... ...
দাঁড়াইল প্রতিমার প্রায়
নগরগুঞ্জনক্ষান্ত নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়॥
... ...
মোরে হেরি প্রিয়া
ধীরে ধীরে দীপখানি দ্বারে নামাইয়া
আইল সম্মুখে—মোর হস্তে হস্ত রাখি
নীরবে শুধালো শুধু, সকরুণ আঁখি,
'হে বন্ধু, আছ তো ভালো ?' মুখে তার চাহি
কথা বলিবার গেনু, কথা আর নাহি।
সে ভাষা ভুলিয়া গেছি।

... ...
সুকোমল হাতখানি লুকাইল আসি
আমার দক্ষিণকরে কুলায়প্রত্যাশী
সন্ধ্যার পাখির মতো। মুখখানি তার
নতবৃন্ত পদ্ম-সম এ বক্ষে আমার
নমিয়া পড়িল ধীরে। ব্যাকুল উদাস
নিঃশব্দে মিলিল আসি নিশ্বাসে নিশ্বাস।
... ...
রজনীর অন্ধকার
উজ্জয়িনী করি লুপ্ত একাকার।

'দূর বহুদূরে... উজ্জয়িনীপুরে' হয়েছে 'হাজার বছর ধরে... পৃথিবীর পথে'; 'শিপ্রা নদী পারে' হয়েছে 'সিংহল সমুদ্র' ও 'মালয় সাগরে' এবং 'বনলতা সেন' পূর্বজনমের প্রথমা প্রিয়ার মতই। মুখে তার লোধ্ররেণু' হয়েছে 'মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য'। 'বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগত' এবং বির্দভ নগর উজ্জয়িনীর কথা মনে করিয়ে দেবে। এখানে ইতিহাস চেতনা সমভাবে কার্যকর। 'প্রিয়ার ভবন/বঙ্কিম সঙ্কীর্ণ পথে দুর্গম নির্জন' প্রতিফলিত 'সবুজ ঘাসের দেশ... চোখে দেখে দারুচিনি-দ্বীপের ভিতর'-এ। 'সন্ধ্যা' এবং 'সন্ধ্যাতারা' জীবনানন্দের সন্ধ্যার ব্যবহারের কথা মনে করিয়ে দেবে। জীবনানন্দের নৈঃশব্দের ব্যবহার এবং বনলতা সেনের ও পথিকের সান্নিধ্যের উল্লেখ মনে করিয়ে দেবে। 'বলেছে সে, 'এতদিন কোথায় ছিলেন?' কি 'হে বন্ধু... আছ তো ভালো'-র প্রতিফলন নয়? 'কুলায়প্রত্যাশী/সন্ধ্যার পাখি' প্রতিফলিত 'পাখির নীড়ের মতো' এবং চিলের কুলায় ফেরায়। 'মুখখানি' বক্ষে নেমে পড়া এবং 'নিশ্বাসে নিশ্বাস' ও 'রজনীর অন্ধকার'-এর 'উজ্জয়িনী' লুপ্ত করা প্রতিফলিত 'থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন'-এ। 'বনলতা সেন'-এ আছে পথিকচিত্ততা এবং বনলতা সেনকে খোঁজ করার ব্যাপার, যা পাঠকদের মনে করিয়ে দেবে 'স্বপ্ন' কবিতাটির প্রথম চার পঙ্‌ক্তির কথা। না, জীবনানন্দ রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ করেননি। বরং রবীন্দ্রনাথ থেকেও উপযোগী কাব্যিক উপাদান সংগ্রহ করে এক অবিস্মরণীয় নতুন সৃষ্টি দিয়ে বাংলা কাব্যসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে গেছেন। সাহিত্যিক ঐতিহ্যের ব্যবহারের আলোকে পাঠক এসব কবির পারস্পরিক অবস্থান নির্ণয় করে নিজেরাও আলোকিত হবেন।

১১
ইংরেজি সাহিত্যসেবী জীবনানন্দের জন্য এ সাহিত্য ছিল অনুপ্রেরণার উৎস। এ সাহিত্য দ্বারা তিনি গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। তার সৃজনশীলতা এ প্রভাবের দ্বারা হয়েছিল উদ্দীপ্ত এবং উজ্জীবিত। না, অনুকরণের চোরাবালিতে তিনি নিমজ্জিত হননি। তাঁর পঠনপাঠন তাঁকে সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর করেছে। মনের পাত্রটি তিনি ভরে নিয়েছেন নানা অনুষঙ্গে। নানা ভাবব্যঞ্জনায়। পঠিত কবিরা তাঁকে সীমা-ছাড়িয়ে যেতে, নিজেকে ব্যাপ্ত করতে এবং প্রসারিত করতে প্রণোদিত করেছে। কাব্যিক মেধা ও মননের শৈল্পিক সৌকর্য তো ছিলই, নানা উৎস থেকে শৈল্পিক সম্ভার আহরণ করে সেই সৌকর্যের যাদুস্পর্শে সৃষ্টি করেছেন অমর সব কবিতা। এই প্রণোদনের প্রক্রিয়াটিকে বলা যেতে পারে 'One lamp has kindled another'। এতে স্বকীয়তার কোন হানি হয় না, বরং আহরিত কাব্যিক উপাদানের অনন্য ব্যবহারে বিস্মিত হতে হয়। চমৎকৃত হতে হয়ে। এক কবির অসাধারণ কাব্যিক উপাদান আরেক ভাষার আরেক কবির কাব্যে এসে নবজীবনের জ্যোতিতে ভাস্বর হয়ে ওঠে। সৃষ্টি হয় সৃজনশীলতার উৎকর্ষের এক অনপনেয় মনুমেন্ট। পাঠকেরা যখন রবীন্দ্রনাথের 'উর্বশী' কবিতাটি পড়ে তাদের মনে পড়ে Swinburne-এর *Atlanta in*

Calydon নাটকের Hymn to Aphrodite-র কথা। যখন 'বর্ষশেষ' কবিতাটি পড়ে তখন মনে পড়ে Shelley's Ode to the West Wind-এর কথা। কিন্তু এতে কি আসে যায়? এই চারটি কবিতাই নিজ নিজ ভাবে অসাধারণ মৌলিক সৃষ্টি। 'বনলতা সেন' পড়তে গিয়েও এরকম বিখ্যাত কবিতার কথা মনে পড়বে। অবধারিতভাবেই। কিন্তু এতে অগৌরবের কিছু নেই। এই প্রসঙ্গে উপরে উল্লিখিত Eliot-র প্রবন্ধটির উদ্ধৃতাংশের সঙ্গে এই প্রবন্ধটি থেকেই আরও কিছু কথা উদ্ধৃত করা যেতে পারে :

> the historical sense compels a man to write not merely with his own generation in his bones, but with a feeling that the whole of the literature of Europe from Homer and within it, the whole of the literature of his own country, has a simultaneous existence and composes a simultaneous order. No poet, no artist of any art, has his complete meaning alone. His significance, his appreciation is the appreciation of his relation to the dead poets and artist. You cannot value him alone; you must set him, for contrast and comparison, among the dead. I mean this as a principle of aesthetic, not merely historical, criticism.

একজন পরিণতি-প্রাপ্ত কিংবা অপরিণত কবির—প্রসঙ্গটি স্বাভাবিকভাবেই এসে পড়ে। একজন পরিণতি-প্রাপ্ত কবির হাতে হবে শিল্প-সৌকর্যমণ্ডিত নব সৃষ্টি; আর অপরিণত কবির হাতে কবিতা হয়ত পর্যবসিত হবে অনুকরণে। Eliot বলেন :

> the mind of the mature poet differs from that of the immature one not precisely in any valuation of 'Personality', not being necessarily more interesting, or having 'more to say', but rather by being a more finely perfected medium in which special, or very varied, feelings are at liberty to enter into new combinations.

এ প্রসঙ্গে কবির মন কাব্যিক উপাদানের একটি সংগ্রহশালায় পরিণত হবার এবং এসব উপাদানের একটি শৈল্পিক পরিণতিতে রূপলাভ করার কথাটি স্মরণ করা যেতে পারে। Eliot বলেন :

> The poet's mind is in fact a receptacle of seizing and storing up numberless feelings, phrases, images, which remain there until all the particles which can unite to form a new compound are present together.

'বনলতা সেন' কবিতাটি পড়তে গিয়ে প্রথমেই পাঠকদের মনে পড়বে Keats-এর 'On First Looking into Chapman's Homer' শিরোনামের সনেটটির কথা :

> Much have I travell'd in the realms of gold,
> And many goodly states and kingdoms seen;
> Round many western islands have I been
> ... ...
> Then felt I like some watcher of the skies
> When a new planet swims Into his ken;
> Or like stout Cortez when with eagle eyes
> He star'd at the Pacific—and all his men
> Look'd at each other with a wild surmise—
> Silent upon a peak in Darien.

শুধু হাজার বছর ধরে পৃথিবীর পথে হাঁটার ব্যাপারটিই নয়, সবুজ ঘাসের দেশ আবিষ্কারের আনন্দের শিহরণের মূল সুরটিও এই সনেটের অন্তর্গত। বনলতা সেনের রূপবর্ণনাটি অনেক পাঠককে Keats-এর Lamia part I-এর 'She was a gordian shape of dazzling hue' এই লাইনটি এবং পরবর্তী কয়েকটি লাইনের কথা মনে করিয়ে

দিতে পারে। বর্ণনার কোন মিল নেই। অনুভূতির এবং আবেগের পটভূমিগত মিলই মনকে নাড়া দেবে। তবে এ তুলনাটিকে খুব গুরুত্ব হয়ত দেয়া যাবে না এ কারণে যে কীটসের বর্ণনাটি একটি অপরূপা সর্পিণীর, কোন মানবীর নয়। 'জোনাকির রঙে ঝিলমিল' কি কীটসের *Endymion* Book II-এর 'beneath the evening's sleepy frown/ Glow-worms began to trim their starry lamps'-এর কথা ক্ষণিকের জন্য হলেও পাঠকদের মনে করিয়ে দেয় না? হয়ত 'পৃথিবীর সব রঙ নিভে গেলে' কোন কোন পাঠককে কীটসের 'To Autumn'-এর 'Soft-dying day'-এর কথাও মনে করিয়ে দিতে পারে। 'হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে' কোন পাঠককে মনে করিয়ে দিতে পারে Yeats-এর The Song of Wandering Aengus'-এর এই দুটি লাইনের কথা :

> Though I am old with wandering
> Through hollow lands and hilly lands.

'বনলতা সেন' আরও একটি কবিতার কথা পাঠকদের মনে করিয়ে দেবে—এটি Edgar Allan Poe-এর ১৮৩১ সালে রচিত 'To Helen'। ১৮৪৮ সালে রচিত 'To Helen' নয়। ১৮৩১ সালে Poe-এর *Poems* নামক কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থের চারটি খ্যাত কবিতার মধ্যে 'To Helen' একটি। এ কবিতায় Poe তাঁর প্রথম প্রেমিকা মিসেস স্টেনার্ড-এর স্মৃতি তর্পণ করেন। Poe-এর ১৫ বছর বয়সের সময়ে এ মহিলার মৃত্যু হয়। এই কবিতার প্রাসঙ্গিক পঙ্‌ক্তিগুলি হলো—

> Helen, thy beauty is to me
> Like those Nicean barks of yore,
> That gently, o'er a perfumed sea,
> The weary, way-worn wanderer bore
> To his own native shore.
> On desperate seas long wont to roam,
> Thy hyacinth hair, thy classic face,
> The Naiad airs have brought me home
> To the glory that was Greece,
> And the grandeur that was Rome.

'Nicean barks of yore' জীবনানন্দে হয়েছে 'হাল ভেঙে যে নাবিক'; perfumed sea হয়েছে 'দারুচিনি দ্বীপের ভিতর', The weary, way-worn wanderer' হয়েছে 'আমি ক্লান্ত প্রাণ এক'; আর 'native shore' যেন বনলতা সেন নিজেই, যে কবিকে 'দুদণ্ড শান্তি দিয়েছিল'। On desperate seas long wont to roam' ধ্বনিত 'সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে/অনেক ঘুরেছি আমি'-তে। 'Thy hyacinth hair' আরও কাব্যময় রূপ লাভ করেছে 'চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা'য় এবং 'Thy classic face' 'মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য'-এ। Poe সবশেষ Helen-কে দেখেন—

> Lo! in yon brilliant window-niche
> How statue-like I see thee stand,
> The agate lamp within thy hand!
> Ah, Psyche, from the regions which
> Are Holy-Land!

কিন্তু জীবনানন্দ বনলতা সেনকে দেখেন অন্ধকারে—'থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন'। দীর্ঘ ক্লান্তিকর সমুদ্রযাত্রা শেষ Poe পৌঁছেন Helen-এর কাছে; আর জীবনানন্দ পৌঁছেন বনলতা সেনের কাছে—শুধু সমুদ্রযাত্রা শেষে নয়, 'হাজার বছর ধরে পৃথিবীর পথে' হাঁটার পর। 'To Helen'-এও 'বনলতা সেন'-এর মূল সুরের

অনেকটুকুই ধ্বনিত। অতীত সাহিত্য-ঐতিহ্য এভাবেই জীবনানন্দের কাব্যিক-মানস সমৃদ্ধিতে অবদান রেখেছে।

'To Helen' একজন নারীকে উদ্দেশ্য করে লিখিত। জীবনানন্দ 'বনলতা সেন' ছাড়াও আরও অনেকগুলি কবিতা লিখেছেন নারীকে উদ্দেশ্য করে, যেমন 'শঙ্খমালা', 'সুদর্শনা', 'শ্যামলী', 'সুরঞ্জনা', 'সবিতা', 'সুচেতনা', 'দীপ্তি', 'শেফালিকা', 'অরুণিমা সান্যাল', 'অনুরাধা', 'রোহিনী' ইত্যাদি।

১২

'বনলতা সেন' একটি 'সমুন্নত' ও ভাবগরিমাপূর্ণ বা sublime কবিতা। কবিতাটি পড়ে আমরা সম্মোহিত হই। 'হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে' পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই পাঠকেরা কালের অসীমতায় নিজেদের আবিষ্কার করে এবং ধ্বনি ও ভাবমাধুর্যের ধারাপরম্পরার মধ্য দিয়ে কবিতার শেষে এসে অন্ধকারে এক রহস্যময়ী নারীর মুখোমুখি থামে। Sublime রচনায় বর্ণনার পুঙ্খানুপুঙ্খতা থাকে না, থাকে 'beautiful' রচনায়। 'বনলতা সেন'-এও পুঙ্খানুপুঙ্খ কোন বর্ণনা নেই। তুলির কয়েকটি টানে কবি ভাবের ক্যানভাসে এক দীর্ঘযাত্রার, এক অনিন্দ্যসুন্দরীর রূপের এবং দিনের সমাপ্তির ছবি আঁকেন এক অনবদ্য শিল্পসৌকর্যের সঙ্গে। 'বনলতা সেন'-এর আবেদনশীলতা অপরিমেয় এবং আমাদের স্মৃতিতে এ কবিতাটির চিরন্তন সৌন্দর্যের আধার হয়ে ভাবগরিমামণ্ডিত একটি সাহিত্যকীর্তি হিসেবে গাঁথা হয়ে যায়। Sublime-এর পাঁচটি উৎসই 'বনলতা সেন'-এ লক্ষণীয় : 'প্রথম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎসব হচ্ছে উদাত্ত গম্ভীর ভাববৃত্ত গঠনের সামর্থ্য,... দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হচ্ছে শক্তিশালী এবং প্রেরণাসম্ভূত আবেগের প্রাণদায়িনী শক্তি। সমুন্নত রচনার এ দুটি সংগঠক উপাদান অত্যন্ত ব্যাপকভাবেই আন্তর উপাদান, বাকিগুলো হচ্ছে কলাকৌশলজাত—যেমন, অর্থালঙ্কার ও বাক্যালঙ্কার নামক দু'ধরনের অলঙ্কারের যথার্থ গঠন-প্রক্রিয়া, তার সঙ্গে থাকবে মহৎ কবিভাষা সৃষ্টির ক্ষমতা, যা কিনা শব্দ নির্বাচন, বাকপ্রতিমা ব্যবহার এবং রচনাশৈলীর বৈচিত্র্য প্রকাশের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে। ঐশ্বর্যদ্যোতক শিল্পকর্মের পঞ্চম উৎস হচ্ছে সমুন্নত কল্পনা ও সৃষ্টিশৈলীজাত সামগ্রিক আবেদন' (সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায়, *লঙিনুসের সাহিত্যতত্ত্ব*, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ২৪)। এক ধরনের অস্পষ্টতা বা দুর্বোধ্যতাও কাব্যে Sublimity বা শীর্ষতা প্রদান করে। 'বনলতা সেন'-এর কথাই ধরা যাক—'চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা', 'মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য', দেহ তার 'দারুচিনি-দ্বীপের ভিতর' 'সবুজ ঘাসের দেশ'-এর মত। তার চোখ 'পাখির নীড়ের মতো'। তাকে হাজার বছরের পথিক এবং নাবিক দেখেছেন 'অন্ধকারে'। সব মিলিয়ে কেমন বনলতা সেন? বনলতা সেন কবির কল্পলোক বিহারিণী। মানসলোকে আবেগের তুলি দিয়েই তার ছবি আঁকা যেতে পারে। এ ধরনের অস্পষ্টতা বা দুর্বোধ্যতা কল্পনাকে উসকে দেয়, অপরূপ রূপ নির্মাণে উদ্বুদ্ধ করে। এ ধরনের অস্পষ্টতা বা দুর্বোধ্যতাকে বলা হয় 'judicious obscurity' বা 'convenient vagueness'। Sublimity সৃষ্টিতে অন্ধকারও একটি ভূমিকা পালন করে। বস্তুত 'বনলতা সেন' কবিতায় অন্ধকারের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হাজার বছরের পথিক এবং সিংহল সমুদ্র ও মালয় সাগরের নাবিকের যাত্রা নিশীথের অন্ধকারে, বিম্বিসার অশোকের জগত ধূসর, বিদর্ভ নগরে অন্ধকারের মধ্যেই ছিলেন পথিক। স্পষ্টতই অন্ধকারের ভাবটি পরে আরো ঘনীভূত হয় : পথিক 'বনলতা সেন'কে দেখেছে অন্ধকারে এবং 'সমস্ত দিনের শেষে' 'থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি

বসিবার বনলতা সেন'। অন্যান্য কবিতায়ও 'অন্ধকার'-এর বিচিত্র এবং ব্যাপক ব্যবহারের আলোকে জীবনানন্দকে 'অন্ধকার'-এর কবিও বলা যেতে পারে।

১৩

শেষে এসে একটি প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হচ্ছে—হাজার বছর ধরে পৃথিবীর পথে হেঁটে, সিংহল সমুদ্র এবং মালয় সাগরে অনেক ঘুরে, বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে থেকে, অন্ধকারে বিদর্ভ নগরে থেকে, কবি যে এত ক্লান্ত হলেন এবং নিজেকে আবিষ্কার করলেন সফেন জীবন-সমুদ্রের মধ্যে, সেকি শুধু বনলতা সেনের কাছ থেকে দুদণ্ড শান্তি পাওয়ার জন্য? এ শান্তি কিসের? অবশ্যই শৈল্পিক এবং নান্দনিক। অর্থসম্পদের পেছনে তো কবি ছোটেন নি, খ্যাতি বা যশের আকাঙ্ক্ষা তাঁকে লালায়িত করে নি। তিনি সৌন্দর্য-পিয়াসী। যাত্রা শেষে সে সৌন্দর্যের সন্নিকটেই পৌঁছেছেন। এই সৌন্দর্যের মানসপ্রতিমার দৃষ্টিগ্রাহ্য বর্ণনা তিনি দিতে পারেন নি, দিয়েছেন কল্পনাগ্রাহ্য বর্ণনা। মূর্ত হয়েও যে বিমূর্ত, শরীরী হয়েও যে অশরীরী, কীভাবে তার অবয়বের ছবি আঁকবেন তিনি? যাকে জাগতিক আলোকে জাগতিক চোখে দেখা যায় না, দিব্যদৃষ্টিতে দিব্যালোকে দেখতে হয়, অবচেতনে যার অধিষ্ঠান তার পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপবর্ণনা কোনমতেই সম্ভব নয়। পথিক তাকে অন্ধকারেই দেখেন, অন্ধকারেই তার কথা শোনেন, শিহরিত হন এবং জীবনের বেচাকেনা আর লেনাদেনা শেষ হলে অন্ধকারেই তার মুখোমুখি বসেন। জাগতিক স্বার্থবুদ্ধিহীন শিল্পী, নান্দনিক সাধনায় নিরত সাধক অপার্থিব সৌন্দর্যের মুখোমুখি হয়েই তৃপ্ত। হাজার বছর ধরে পথিক-নাবিক অনন্ত পথ পরিক্রমার শেষে নান্দনিক সৌন্দর্যলোকের মানসপ্রতিমার সান্নিধ্যেই পরম প্রাপ্তির প্রশান্তিতে সমৃদ্ধ। কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর মত তিনিও যেন বলতে চান—

> নাহি চাই খ্যাতি, যশে কাজ নাই, চাহিনাক ধনমান,
> তোমারি স্তবের যোগ্য করিয়া শিখাইয়া দাও গান।

নান্দনিক প্রশান্তি এবং সৌন্দর্যের রূপায়ণই কবির ঐকান্তিক অভিলাষ।

বনলতা সেন

সুব্রত অগাস্টিন গোমেজ

বনলতা সেন প্রারম্ভিক পাঠকালীন মোহাবেশেও উঁকি দেয় মনে—কে এই বনলতা সেন? এবং এই প্রশ্নটির সদ্‌গতির কামনায় আমারও মানস-পরাভ্রমণ আরব্ধ হয়। জীবনানন্দের সাথে সাথেই। এবং চরম হতাশায় খেয়াল করি, প্রশ্নটির উত্তরের পথে হিমালয়ের মতো বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে আরও হাজারো প্রশ্ন—কেন এ ভ্রমণ? এ কি নস্টালজিয়া? পলাতক মনোবৃত্তি? যদি তা হয়, তবে কিসের থেকে? কার থেকে? কী জন্যে? কেন?

সূত্র ১

দেখতে পাচ্ছি, সমস্ত ভ্রমণের চূড়ান্তে, কবির গন্তব্য নির্দিষ্ট হচ্ছে বনলতা সেনের সম্প্রীতি-সান্নিধ্যে। এবং কবির তরফে এটি যদৃচ্ছ নয় :

> থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।

অর্থাৎ কবির ভাগ্যচক্রই এই প্রত্যাবর্তন নির্দিষ্ট করে দিচ্ছে।

কবি যেন রয়েছেন এক ল্যাবিরিন্থের মধ্যবিন্দুতে—যেখান থেকে চলে যান, আবার অমোঘভাবে সেখানেই ফিরে আসেন। এই পুনরাবৃত্তিতে তাঁর কোনো অসুখের পরিচয় যদিচ এ-কবিতায় দুর্লক্ষ্য, তথাপি জিজ্ঞাসা জাগে—কেন কবি বনলতা সেনের কাছ থেকে পালিয়ে যান বারবার?

সূত্র ২

বনলতা সেনের ঈষৎ পরিচয় পাচ্ছি দ্বিতীয় স্তবকে। লক্ষণীয়, কবি তাঁর উপমা খুঁজে আনছেন অন্ধকার অতীত থেকে, যে-অতীত একদা স্বর্ণাভ ছিল। কেন?

প্রথম স্তবকে কবির যে-পর্যটন, তারও বিশেষাংশ এই তামসিক অতীতেই। একে রোম্যান্টিক অতীতপ্রীতি ভাবা যায়। বর্তমানের অসহ দৈন্যে আশ্রয় খুঁজেছেন কবি ধূসর অতীতে। পেয়েছেন কি? মনে তো হয় না। পেলে তো সেখানেই তাঁর তীর্থার্তির চূড়ান্ত হ'ত, তিনি থেমে যেতেন, যেখানে থেমেছিলেন কীট্‌স্।

অতীত তাঁকে গ্রহণ করে নি, এবং যে-কারণেই তিনি বর্তমান-বিবাগি হয়ে থাকুন না কেন, সেই বর্তমানই করেছে তাঁর সোৎকণ্ঠ প্রতীক্ষা—আর, কবিও তাকে পুনরাবিষ্কার করেন :

> ...অতিদূর সমুদ্রের পর
> হাল ভেঙে যে-নাবিক হারায়েছে দিশা
> সবুজ ঘাসের দেশ যখন সে চোখে দেখে দারুচিনি-দ্বীপের ভিতর

তেম্‌নি। তাহলে মুশকিল কোথায়?

সূত্র ৩

এইখানেই বনলতা সেনের পরিচয়ে সংশয়। শাদা চোখে শ্রীমতী সেন কবির প্রিয়তমা (Beloved) শুধু নন, প্রেমিকা (lover)-ও বটেন; প্রত্যুত, চোখে আছে তাঁর পাখির নীড়ের

বরাভয়। তবে কবির এই অস্থৈর্যের কারিকা কে?—যদি হন বনলতা সেন, তিনি তো তাহলে কবির প্রিয়তমা প্রেমিকা হতে পারেন না। যদি বা অন্যত্র ঘটে থাকে এর উদ্ভব, সেক্ষেত্রে, কবির অতীতে অবসরণের কী দরকার? তিনি তো স্বচ্ছন্দে প্রিয়ার চোখের নীড়ে আশ্রয় নিতে পারতেন...

কবি এবং বনলতা সেন পরস্পরকে ভালবাসেন, তথাচ কবির চিত্তবৈকল্যের উৎসও বনলতা সেন—কে তবে তিনি?

সূত্র ৪

তৃতীয় স্তবকে দেখতে পাই, ঘরে ফেরার আয়োজনে প্রকৃতির সম্মোহন-সুন্দর বর্ণনা। এবং এই প্রকৃতিকে কবি কোনো ধূসরিম অতীত হতে আহরণ করেন নি, করেছেন শাশ্বত বর্তমান থেকে। গোটা কবিতার সবচেয়ে মনোগ্রাহী পঙ্‌ক্তিগুলো রয়েছে সম্ভবত এই স্তবকেই। যে অপূর্ব তথা অভূতপূর্ব মনশ্চিত্রাবলির সমাহার দেখি আমরা এই স্তবকে,—যথা : 'শিশিরের শব্দের মতন' সন্ধ্যা, 'ডানার রৌদ্রের গন্ধ' মোছা, 'পৃথিবীর সব রঙ' নিভে যাওয়া, 'সব নদী'র ঘরে ফেরা, ইত্যাদি ইত্যাদি—এগুলোকে কবির পাশব-প্রবল ভাববিহ্বলতারই বহিঃপ্রকাশ বলে ধারণা হয়।

প্রকৃতির—বাংলাদেশের, এবং কবির চিরপরিচিতি প্রকৃতির—প্রতি কবির এই অতলান্তিক ভালবাসা, এই Home, sweet home!-জাতীয় ঘর-দুর্বলতা, কিসের ইঙ্গিত বহন করে?

ভিন্ন কাল এবং ভৌগোলিক অবস্থান (সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে...) কবিকে যে-প্রশান্তিপূত স্থৈর্য দানে হ'ল অপারঙ্গম, তা তাঁকে জোগাচ্ছে শেষ পর্যন্ত তাঁর সমকালীন স্বদেশ। যে-স্বদেশ এবং সমকালের দৈন্যে, দুর্দশায় তিনি পালিয়ে বাঁচতে চেয়েছেন, আবার তারই প্রতি সুগভীরতম ভালবাসায় তিনি ফিরে এসেছেন তারই কোলে। সীমাকে অসীম করে তিনি বাড়াতে চেয়েছেন আপন চক্রমণের পরিধি : স্থান-কালের সংকীর্ণতাকে ভেঙে : তাতে সৃষ্ট হয়েছে শুধু নাস্তি, যা তাঁকে করেছে ত্রিশঙ্কু কেবলই। অগত্যা, হতাশ কবি হয়েছেন পুনর্মূষিক, ফিরেছেন সসীমের গণ্ডিতে। অসীমে করেছিলেন যার অন্বেষণ, এবার খুঁজেছেন তাকে সীমায়, এবং, বোধ করি, পেয়েছেন। যে-নীড়ের সন্ধান করেছে তাঁর পথিক পরান, সে-নীড় বনলতা সেন—তাঁর স্বদেশ, সমকাল।

অতীত কাউকে দেয় না নিত্যশ বসতি, দেয় শুধু হাহাকার—বিচ্ছেদের ভস্মলীন দাহ। রবীন্দ্রনাথ একদা ফিরে গিয়েছিলেন অতীতে, শিপ্রানদীপারে, তাঁর পূর্বজনমের প্রথমা প্রিয়ার কাছে, পুনর্মিলের মাহেন্দ্রলগ্নে যে তাঁকে বলেছিল, 'হে বন্ধু, আছ তো ভালো?' এ-সম্ভাষণে আছে কুশল-কামনা, ভালবাসাও, কিন্তু নেই এতে তিলমাত্র আমন্ত্রণ যা আছে বনলতা সেনের 'এতদিন কোথায় ছিলেন?'-এ। ওখানে, ভূতপূর্ব প্রেমিককে কষ্টে হ'লেও দ্বার থেকে ফিরিয়ে দে'য়া, এখানে, হারিয়ে যাওয়া প্রেমাস্পদকে ঘরে তুলে নে'য়া। বর্তমানের বদলে যা চেয়েছিলেন কবি অতীতের কাছে, তা বর্তমান, যে-বর্তমানকে তিনি পেয়েছিলেন একদা অসতর্কতায়, রোদ-হাওয়ার মতো স্বাভাবিকতায়, তাকেই তাঁর আবার অর্জন ক'রে নিতে হ'ল অন্ধকার অতীতের সমুদ্র মন্থন ক'রে। মনে পড়ে উইলিয়াম ব্লেইকের *ইনোসেন্স্* ও *এক্সপিরিয়েন্স্*-এর পর্যায়গুলোর কথা। মানুষ জন্মায় বটে *ইনোসেন্স্*-এর ভিতর, কিন্তু যতদিন না সে এক্সপিরিয়েন্স্-এর মধ্যে দিয়ে তাকে পুনরর্জন করতে পারছে, ততদিন *ইনোসেন্স্* তার জন্য অর্থহীন।

ক্লান্ত, বিধ্বস্ত জীবনানন্দের সংবুদ্ধির উদয় হ'ল। তিনি জানলেন, সমস্ত দুর্দশা-সত্ত্বেও, একমাত্র মোক্ষ তাঁর বনলতা সেন—তাঁর স্বদেশ, স্বকাল।

কবি ঘরে ফিরলেন।

(১৯৮৭)

বনলতা সেন

সুমিতা চক্রবর্তী

বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকার প্রথম বছরের দ্বিতীয় সংখ্যায় (পৌষ, ১৩৪২) মুদ্রিত হয়েছিল 'বনলতা সেন' কবিতাটি। তাঁরই পরিকল্পিত 'এক পয়সায় একটি' গ্রন্থমালার অন্তর্গত হয়ে কবিতাভবন থেকে 'বনলতা সেন' কবিতা-সংকলন প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৪২ সালের ডিসেম্বর মাসে বারোটি কবিতা নিয়ে। পরে সিগনেট প্রেস থেকে সংকলনটি বর্ধিত আকারে প্রকাশ পায়। কিন্তু 'বনলতা সেন' রচিত হবার পর থেকেই কবিতাটি সেই সংকলনের, জীবনানন্দের কবিতা-সম্ভারের এবং বাংলা কাব্যজগতের একটি অসামান্য সৃষ্টি হয়ে আছে। এই কবিতায় একত্রে সম্মিলিত জীবনানন্দের একাধিক প্রতীকী চিত্রকল্প—পথ হাঁটা, হাজার বছর, নাবিক, রাত্রি, চিল, নদী এবং সর্বোপরি নারী—এখানে 'বনলতা সেন'। এই নামেই এই নারী উপস্থিত হয়েছে তাঁর অন্য কবিতায়—"শরীরে ঘুমের ঘ্রাণ আমাদের—ঘুচে গেছে জীবনের সব লেনদেন;/'মনে আছে?' শুধাল সে—শুধালাম আমি শুধু, 'বনলতা সেন'?" (হাজার বছর শুধু খেলা করে', বনলতা সেন, ১৯৫২ সংস্করণ) এ ছাড়াও একাধিক কবিতায় ভিন্ন নামে, বহু কবিতায় নামহীনা রূপে এই নারী-প্রতীকের উপস্থিতি।

'হাজার বছর' কেবল এক হাজার বছরই নয়—বহু প্রজন্ম, বহু শতাব্দী। নিত্যগতিশীল সময় সম্পর্কিত চেতনা জীবনানন্দের লেখায় অস্তিত্বের এক অবিচ্ছেদ্য মাত্রারূপে প্রতিভাত হয়। সেই প্রবহমানতার সঙ্গে মানুষের যাত্রাকে কবি মিলিয়ে দিয়েছেন প্রথম পঙ্‌ক্তিতে। সভ্যতার সূচনা থেকেই মানুষের আত্মায় নিহিত আছে এক অন্তহীন অন্বেষণ। সে খোঁজে—নিরাপত্তা, স্বাচ্ছন্দ্য, প্রেম—অবশেষে শান্তি। জীবনানন্দের বহু কবিতায় এই অন্বেষণের থীম পথ হাঁটা এবং সমুদ্রযাত্রার চিত্রকল্পে রূপায়িত হয়েছে। এই কবিতায় দুটি ইমেজই আছে। 'বনলতা সেন' প্রেমের কবিতা বলেই প্রধানত পরিচিত। আমরা এটিকে মানুষের অনন্ত অন্বেষণের শেষে এক শান্তি পাওয়ার কবিতাও বলতে পারি। সেই শান্তি হয়তো মৃত্যু ছাড়া মানুষের পক্ষে স্পর্শ করা সম্ভব নয়। 'বনলতা সেন' কবিতায় মৃত্যু অনুষঙ্গও বেশ লক্ষ্যগোচর।

কবিতাটির উপস্থাপনা ঘটে এই সর্বকালীন অন্বেষণের প্রেক্ষাপটে। 'সিংহল সমুদ্র' আর 'মালয় সাগর'—এই দুটি নামে এরপর কবিতাটির ভৌগোলিক সীমা একটু বেঁধে দেওয়া হয়। জীবনানন্দের কবিতার ভাবানুষঙ্গ জমে ওঠে আধুনিক আন্তর্জাতিক মননের সামগ্রিক নির্যাস ছেঁকে নিয়ে কিন্তু প্রায় সর্বত্রই তাঁর কবিতার দৈশিক স্থাপনা ঘটে ভারতের জল-হাওয়া-মাটিতে। মিশর-ব্যাবিলন তাঁর কবিতায় নিয়ে আসে প্রাচীন সভ্যতার স্মৃতিসৌরভ আর আবহের বিচিত্র ব্যঞ্জনা। কিন্তু প্রায় কখনোই তাঁর কবিতার পাদপীঠভূমি হয়নি ভারত ছাড়া অন্য কোনো দেশ। মালয় ও সিংহলে একদা বিস্তৃত হয়েছিল ভারত-সংস্কৃতি। তৃতীয় পঙ্‌ক্তির 'বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে' বলার মধ্যেও বৌদ্ধ ধর্মের সমুন্নতি-কালের

ইঙ্গিত। দূর-অতীতে বিম্বিসারের বুদ্ধ-ভক্তিতে, অশোকের ধর্মবিজয়ে মৈত্রীর বিস্তার ঘটেছিল। সেই বিশ্বাসী সময়টিকে আধুনিক কালের সংশয়-পীড়িত অস্তিত্বের বিপরীতে তিনি একাধিক কবিতায় ব্যবহার করেছেন। কিন্তু বাণিজ্যিক (সিংহল, মালয়ের উল্লেখে বাণিজ্যিক বিস্তারের ইঙ্গিতও থাকা সম্ভব) ও দার্শনিক সমৃদ্ধির জগতে বিচরণ করেও জীবনচরিতার্থতার সন্ধানী পথিক-মানুষের অন্বেষণ তৃপ্ত হয় না, বেড়ে যেতে থাকে ক্লান্তি। প্রেমের জন্য, শান্তির জন্য মানুষের মনে জমতে থাকে এক আকাঙ্ক্ষা। সেই প্রেম-প্রশান্তির প্রতিমা হয়ে প্রথম স্তবকের শেষ পঙ্‌ক্তিতে 'নাটোরের বনলতা সেন'-এর অবিস্মরণীয় আবির্ভাব।

জীবনানন্দের কবিতায় দেখা যায় যে, নিসর্গের অকৃত্রিম শুদ্ধতার সংস্পর্শে কবি মানব-সভ্যতার কুটিল বঞ্চনার হৃদয়ক্ষত থেকে নিরাময় হয়ে ওঠেন। তাঁর মন সুস্থ হয়। তাঁর কবিতার নায়িকাদের অনেকেরই নাম প্রকৃতি-সংলগ্ন—অরুণিমা, শেফালিকা, মৃণালিনী, সরোজিনী, বনলতা। প্রেমও মানুষকে দিতে পারে সেই শুদ্ধ শান্তির একটু ছোঁয়া। জীবনানন্দের প্রকৃতি-সংবেদনা আর প্রেম-সংবেদনা তাই মাঝে মাঝেই একাত্ম হয়ে যায়। বহু ক্ষেত্রে তিনি নারী-শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রকৃতি-শরীরে আরোপ করেন। অন্ধকারের স্তন ও যোনি-র বিখ্যাত উদাহরণ মনে পড়ে ('অন্ধকার', বনলতা সেন, ১৯৫২ সংস্করণ) মনে পড়ে অন্ধকারের 'হিমকুঞ্চিত জরায়ু ছিঁড়ে' ভোরের রৌদ্রের বের হয়ে আসার ছবি ('শিকার', বনলতা সেন)। আবার জীবনানন্দের রমণী-রূপ বর্ণনায় প্রায়ই এসে পড়ে নিসর্গ-প্রতিভাস। শরীরের রেখাগুলি অস্পষ্ট হয়ে মিশে যায় আকাশে, ধানক্ষেতে, রৌদ্রে, কুয়াশায়, রাত্রিতে, নদীতে, বৃক্ষলতায়। বনলতা তেমনই এক নিসর্গলীন নারী।

বনলতা সেনের নামে এবং মূর্তিতে জীবনানন্দের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় স্মৃতি এবং বাস্তবের কোনো নারীর অবয়বও মিশে আছে—একাধিক সমালোচকের এ অনুমানও খুবই সঙ্গত।

আমরা নিদর্শন উপস্থিত করব জীবনানন্দেরই লেখা থেকে। তাঁর রচিত সব গল্প-উপন্যাসই (জীবৎকালে অপ্রকাশিত) তাঁর আত্মজীবনের উদ্ঘাটন। ১৯৩৩ সালে তিনি বেশ কয়েকটি গল্প-উপন্যাস লিখেছিলেন। কিছু সম্পূর্ণ, কিছু অসম্পূর্ণ। একটি উপন্যাস 'প্রেতিনীর রূপকথা'য় (রচনাকাল ১৯৩৩, প্রকাশ শারদীয় প্রতিক্ষণ, ১৩৯৩। উপন্যাসের নামটি সম্পাদকমণ্ডলী প্রদত্ত) দুই প্রেমিকা নারীর নাম 'বিনতা' ও 'চারুলতা'। দুটি নামের সঙ্গেই 'বনলতা' নামের সাদৃশ্য। ১৯৩৩-এর আগস্ট-এ রচিত 'কারুবাসনা' (গ্রন্থনাম সম্পাদকমণ্ডলী প্রদত্ত, জীবনানন্দ সমগ্র, তৃতীয় খণ্ড, প্রতিক্ষণ পাবলিকেশন্‌স্, কলকাতা, ১৯৮৬) উপন্যাসে সরাসরি এসেছে বনলতার বর্ণনা।—"কিশোরবেলায় যে কাল মেয়েটিকে ভালবেসেছিলাম কোন এক বসন্তের ভোরে, বিশ বছর আগে যে আমাদেরই আঙিনার নিকটবর্তিনী ছিল,..." (পৃ. ৩৯)। সেই মেয়েটিকে বেশ বাস্তব পটভূমিই দিয়েছেন লেখক উপন্যাসে। তার বাবার নাম কেদারবাবু (পৃ. ৫৪), পদবি সেন হওয়া অসম্ভব নয়। বৈদ্য বংশোদ্ভূতদের মধ্যে অনেকেই ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। জীবনানন্দের কিশোর বয়সের প্রতিবেশিনী ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হওয়া স্বাভাবিক। আরো বিবরণ আছে—"সেই বনলতা—আমাদের পাশের বাড়িতে থাকত সে। কুড়ি-বাইশ বছরের আগের সে এক পৃথিবীতে, বাবার তার লম্বা চেহারা, মাঝ-গড়নের মানুষ—শাদা দাড়ি, স্নিগ্ধ মুসলমান ফকিরের মতো দেখতে,...সেই খড়ের ঘরখানাও নেই তাদের আজ;..." (পৃ. ৩৯)। এখানেই শেষ নয়—"বছর আষ্টেক আগে বনলতা একবার এসেছিল। দক্ষিণের ঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে চালের বাতায় হাত দিয়ে মা ও পিসিমার সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বললে সে। তারপর আঁচলে ঠোঁট

ঢেকে আমার ঘরের দিকেই আসছিল। কিন্তু কেন যেন অন্যমনস্ক নত মুখে মাঝপথে গেল থেমে,... বাঁশের জঙ্গলের ছায়ার ভিতর দিয়ে চলে গেল সে।" (পৃ. ৪০)

বাস্তবের এক শ্যামবর্ণা কিশোরীকে মৃদু ভালোলাগার স্মৃতি থেকেই বনলতা সেন হয়তো নাম ও পদবিসহ জীবনানন্দের কবিতাটিতে উঠে এসেছে।

কিন্তু বস্তু-উপাদান থেকে শিল্প হয়ে ওঠার প্রক্রিয়ার মধ্যে কল্পনা, আবেগানুভব ও উপলব্ধির যে প্রগাঢ় সঞ্চার থাকে তারও প্রথম আভাস আছে এই উপন্যাসেই—'অনেক দিন পরে আজ আবার সে এল; মনপবনের নৌকায় চড়ে, নীলাম্বরী শাড়ি পরে, চিকন চুল ঝাড়তে-ঝাড়তে আবার সে এসে দাঁড়িয়েছে; মিষ্টি অশ্রুমাখা চোখ, ঠাণ্ডা নির্জন দুখানা হাত, ম্লান ঠোঁট, শাড়ির ম্লানিমা। সময় থেকে সময়ান্তর, নিরবচ্ছিন্ন, হায় প্রকৃতি, অন্ধকারে তার যাত্রা—' (পৃ. ৪০)। ১৯৩৩-এর এই কল্পনা-লোকচারিণী নারী অচিরেই হয়ে উঠল জীবন-প্রতিমা 'বনলতা সেন'। কবিতাটি লেখা হয়েছিল ১৯৩৪ সালে। পাণ্ডুলিপি থেকে তা জানা গেছে।

'নাটোরের' বনলতা সেন বলাতে চিত্রকল্পটি আরো ব্যঞ্জনা পেয়েছে। প্রথমত তার স্থানিক পরিসর হয়েছে প্রত্যক্ষ। দ্বিতীয়ত 'নাটোর' নামটির সঙ্গে এক সময়ের বৈষ্ণব প্রভাব সিঞ্চিত এবং রানী ভবানীর স্মৃতি-সমৃদ্ধ অতীত বাংলার ছবিও ভেসে আসে। সমকালীন 'রূপসী বাংলা'-র কবিতায় বিশালাক্ষী-কালীদহ-গঙ্গাসাগর-ধলেশ্বরী; চণ্ডীদাস-বল্লাল সেন-রাজবল্লভ-রামপ্রসাদ; কীর্তন-ভাসান গান-রূপকথা-যাত্রা-পাঁচালীর উল্লেখেও ঐ একই অনুষঙ্গ। এই বাতাবরণ, এই চালচিত্র 'নাটোর' নামে। সেই নাটোরে, একালের মাটিতে আবির্ভূত বনলতা সেন। কবিকে দু'দণ্ড শান্তি দিয়েছিল সে—। 'শান্তি' শব্দটি আমাদের এমনভাবে টান দেয় যে 'দু'দণ্ড' শব্দবন্ধটি প্রায়ই আমরা ভুলে থাকি। মানুষের তৃপ্তিবোধের চিরন্তন ক্ষণিকতা ব্যক্ত এই শব্দে। চিরকালের শান্তি বলে কিছু নেই। চিরকালের অতৃপ্তিই মানুষকে চির-অন্বেষী করে রেখেছে।

প্রথম স্তবকটিতে আছে মানবাত্মার চিরকালীন অন্বেষণের বাণী। দ্বিতীয় স্তবকটি শুরু হয়েছে বর্তমান কালের ব্যক্তিপ্রেমের চিত্র রচনায়। প্রেম মানুষকে, সাময়িক হলেও, শান্তি দেয়, শান্তি দেয় প্রকৃতির শুদ্ধতাও। এই স্তবকে বাস্তবের নারী আর নিসর্গ-প্রতিমা মিলেমিশে প্রতীকী নারী 'বনলতা সেন'কে রচনা করেছে। প্রেয়সীর দিকে চেয়ে প্রত্যাশী কবি দেখেন 'বিদিশার নিশা'র মতো চুল তার 'মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য'। আজকের নায়িকাকে মিলিয়ে নেওয়া ঐতিহ্যের সঙ্গে—তথা ভারতীয় হর্ম্যভাস্কর্যের চিরকালীন সৌন্দর্যের অনুষঙ্গে। হয়তো বর্তমান কালের কৃত্রিমতা-ক্লান্ত, ছিন্নমূল কবিসত্তা অতীতের রূপময় ও স্বস্থ যুগের স্মরণে আশ্রয় পেতে চেয়েছে। প্রথম স্তবকের 'বিদর্ভ নগর'-এর উল্লেখও একই কারণে। 'চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা'র পুনরুচ্চারিত দীর্ঘ স্বরধ্বনিতে ক্লান্তি ও বিষাদ এবং সেই সঙ্গে আবেশ-নিবিড় মন্থরতা ধ্বনিত হয়—লক্ষ করেছেন সকলেই। একটি ব্যাপ্তি—নিঃসীমতার ব্যঞ্জনাও হয়তো কবির কাঙ্ক্ষিত ছিল। এরপর আসে একটি উপমা—সমুদ্রে পথ হারানো, দিশাহারা ও মৃত্যুমুখী নাবিকের চোখে যে প্রবল জীবনাশ্বাস বহন করে আনে দারুচিনি-গন্ধময় দ্বীপের শ্যাম তৃণভূমি—কবির মনে বনলতা সেনও আসে সেই আশ্বাস নিয়ে। ছিন্নহাল নাবিকের মতো আধুনিক মানুষের দিশাহীন, নিরাপত্তাহীন জীবন। প্রেমই সেখানে একমাত্র ক্ষণ-প্রশান্তির আশ্রয়। 'সবুজ ঘাসের দেশ' সেই প্রেমের তুলনা। ঘাস জীবনানন্দের কবিতায় সতেজ প্রাণের প্রতীক। 'দারুচিনি দ্বীপ' আবার নিয়ে আসে প্রাচীন ভারতের সমৃদ্ধির স্মৃতি—মশলার সুগন্ধ। সুঘ্রাণের ইন্দ্রিয়ঘন তৃপ্তির অনুষঙ্গও আছে। কিছুটা হয়তো 'দারুচিনি' এসেছে নজরুল

ইসলামের 'দারুচিনি দেশ'-এর 'দূর দ্বীপবাসিনী'র সঙ্গে বনলতা সেন-এর আংশিক সাদৃশ্যে। বনলতা সেন-এর শরীরে মিশেছে মধ্যপ্রাচ্যীয় সেই বিশেষ ধরনের বিলাসী-রোমান্টিক আবেশ। এই শেষের আবিষ্টতাটি এক সময়ে সত্যেন্দ্রনাথ, মোহিতলাল, নজরুলের কলম ধরে কিছুটা জমাট বেঁধেছিল বাংলা কবিতায়। তার জের চলে এসেছিল জীবনানন্দের প্রাথমিক রচনাগুলিতে—যার কিছু পরিচয় আছে 'ঝরা পালক'-এ। অন্তত একটি কবিতায় আছে সেই পরিবেশ ও সংস্কৃতির অতুলনীয় ভাবসারাৎসার। সে কবিতাও এই সংকলনের অন্তর্ভুক্ত—'নগ্ন নির্জন হাত'। এই কবিতায় পাই 'অপরূপ খিলান ও গম্বুজের বেদনাময় রেখা—/লুপ্ত নাশপাতির গন্ধ—'। এখানে আছে 'রামধনু রঙের কাচের জানালা' আর 'রক্তিম গেলাসে তরমুজ মদ'।

বহু উৎসজাত (পাশ্চাত্য উৎসের প্রসঙ্গে পরে আসছি) এই তিলোত্তমা বনলতা কিন্তু কথা বলে সম্পূর্ণ একালের ভাষায়। কবিতাটি একান্তভাবে আমাদেরই ভালবাসার কবিতা হয়ে ওঠে এই গভীর আশ্বাসময় বাক্যটির নরম উচ্চারণে। জীবনানন্দের মতো কবিরাই এইভাবে বাজাতে পারেন নিজের কালের বীণাটিতে চিরকালের রাগ।

দ্বিতীয় স্তবকের শেষ পঙ্‌ক্তিতে সুষ্ঠু হয়েছে সেই আশ্চর্য উপমাটি—'পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে'। প্রাথমিক অর্থ সুস্পষ্ট। পাখির নীড় সন্ধ্যার পাখির আশ্রয়, পক্ষীশাবকের আবাস, পক্ষীমাতার নিবিড় মমতার আড়াল সেখানে। সেই আশ্রয়ের দ্যোতনা প্রেমিকার চোখে ও সান্নিধ্যে। এটাই প্রধান অর্থ। একদা একটি সেমিনারে কেতকী কুশারী ডাইসন-কে প্রশ্ন তুলতে শুনেছিলাম—নীড়ের বহিরঙ্গ রূপটিই বা উপেক্ষণীয় হবে কেন? আয়ত-পরিসর, ডিম্বাকৃতি ডৌলের যে পক্ষীনীড়ের ছবি আমরা সাধারণত দেখি—পূর্ব ভারতীয় মেয়েদের আয়ত টানা চোখের সঙ্গে তার আকারগত সাদৃশ্যও থাকতে পারে। এই অনুমানের বিরুদ্ধে উপস্থিত করা যাক জীবনানন্দেরই একটি মন্তব্য। আধুনিক বাংলা কবিতার ইংরেজি অনুবাদের একটি সংকলন সম্পাদনা করেছিলেন দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। সিগনেট প্রেস, কলকাতা থেকে ১৯৪৫ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত সংকলনটিতে অন্তর্ভুক্ত ছিল মোহিতলাল মজুমদার থেকে সুকান্ত ভট্টাচার্য পর্যন্ত কবিদের রচনা, অনুবাদক ছিলেন প্রধানত মার্টিন কার্কম্যান (Martin Kirkman)। 'বনলতা সেন' কবিতার অনুবাদ অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়েছিল কবির কাছে। জীবনানন্দ এ বিষয়ে দেবীপ্রসাদকে চিঠিতে লিখেছিলেন—'Kirkman-এর Banalata Sen খুবই ভালো হয়েছে, সর্বান্তঃকরণে অনুমোদন করছি। এই কবিতাটির এক জায়গায় 'raising her birds-nest eyes' আছে, 'পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে'র এত বেশি literal translation না করে কিছুটা ভাবানুবাদ করতে পারা যায় না কি? বাংলায় আমি নীড় নয়—নীড়ত্বের সঙ্গে চোখের তুলনা করেছিলাম।' (১৪.৯.৪৪ তারিখে বরিশাল থেকে লেখা চিঠি। জীবনানন্দ দাশের কাব্যসংগ্রহ, দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, ভারবি, ১৯৯৩, পৃ. ৮৪২)। 'নীড়ত্ব' অর্থাৎ আশ্রয় ও ক্লান্তি মুছে দেওয়া প্রশান্তির বোধের ব্যঞ্জনাই এখানে প্রধান।

'নীড়' শব্দটিতে থাকতে পারে আরো একটি সংকেত। কথাটি মনে হয় জীবনানন্দের সামগ্রিক রচনার পরিপ্রেক্ষিতে। প্রকৃতি ও প্রাণিজগৎ জীবনানন্দের কাছে অকপট ও বিশুদ্ধ এক জীবন-চেতনার অভিপ্রকাশ। সেই প্রাকৃত জীবনের মূল গ্রন্থিগুলি হল জন্ম-মৃত্যু, আহার-নিদ্রা, আত্মরক্ষণ ও বংশবৃদ্ধি। এর বাইরে প্রাণিজগতের কোনো জীবন-প্রবৃত্তি নেই। জীবচক্র সচল রাখার জন্য অন্যতম জীবনাবেগ হল যৌনকামনা। নরনারীর প্রেম সম্পর্কে শুদ্ধ যৌনতা ছাড়াও বহু মানবিক সম্পর্কের স্তর ও আভা আছে। কিন্তু মানবেতর পশু-পাখির যৌনতাবোধ যৌনতারই বোধ, প্রেমের বোধ নয়। জীবনানন্দের কবিতায় নীড়

শব্দটি একাধিকবার আছে। কিন্তু তা কেবল আশ্রয় বা প্রশান্তি বোঝাবার জন্য নয়। পাখির নীড়, বস্তুত, কোনো চিরকালীন আশ্রয় সংকেতিত করেও না। তা পাখির মিলনঋতুর ফল ধারণের জন্য নির্মিত এক সাময়িক আবাস। শাবক বড় হয়ে উঠলেই নীড়ের প্রয়োজন শেষ। এ জন্যই তাঁর কবিতায় প্রায়ই নীড়ের কাছাকাছি 'ডিম' শব্দটিও পাই। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র 'পাখিরা' কবিতাটি খুবই উল্লেখ্য। সেখানে উড়ন্ত পাখির দল 'অন্য কোনখানে' উড়ে চলে যায় না। তারা নীড় বাঁধার কথা ভাবে কারণ 'তাদের প্রথম ডিম জন্মিবার এসেছে সময়'। অতএব বনলতা সেনের চোখের সঙ্গে পাখির এই উপমা প্রশান্তি ও আশ্রয়ের অনুভব অবশ্যই বোঝায়, সেই সঙ্গে ভালবাসার শারীরতৃপ্তির মুগ্ধ বোধকেও স্পর্শ করে হয়তো বা। বিদিশারাত্রির অন্ধকার আর খোলা চুল (অভিসারিকা) যৌনমিলনের ইঙ্গিতও কি দেয় না? চুল ও যৌনচেতনার সংযোগ সারা পৃথিবীতেই স্বীকৃত—বিশ্বাসে, সংস্কারে ও শিল্প-সাহিত্যে।

'বনলতা সেন' কবিতার প্রথম দুটি স্তবকের আলোচনায় একটি বিদেশী কবিতার উল্লেখও আবশ্যিক। বহুপাঠী জীবনানন্দের বহু কবিতাতেই পাশ্চাত্য কাব্য-পঙ্‌ক্তির ছায়া কাঁপে। সে গ্রহণে কখনো তাঁর দ্বিধা ছিল না কারণ তিনি জানতেন—সে উপকরণ নবরূপে পুনঃসৃষ্ট হবে তাঁর রচনায়। প্রথম দুটি স্তবকের সঙ্গে মিল পাওয়া যায় এডগার অ্যালান পো (Edgar Allan Poe) রচিত 'টু হেলেন' (To Helen) নামের কবিতাটির। যেমন বনলতা সেন তেমনিই সেই কবিতায় চির-নায়িকা হেলেন-এর সৌন্দর্যস্মৃতি হয় ক্লান্ত নাবিকের যাত্রা-পাথেয়।

Helen thy beauty is to me
Like those Nicean barks of yore,
That gently over a perfumed sea
The weary way-worn wanderer bore
To his own native shore.

পো-র কবিতার প্রথম স্তবকের 'weary way-worn wanderer' জীবনানন্দের কবিতায় 'ক্লান্ত প্রাণ এক' এবং হাজার বছর ধরে পথ-হাঁটা পথিকে পরিণত হয়েছে। নাবিক-ইমেজও পথিক-ইমেজের সঙ্গে মিশ্রিত। কিন্তু অতীতকাল, দীর্ঘ যাত্রা, পথিক, সমুদ্র ও ক্লান্ত নাবিকের বিন্যাসে সাদৃশ্য থাকলেও 'দু-দণ্ড শান্তি' শব্দ দুটি জীবনানন্দের কবিতাকে দিয়েছে গভীরতর ও আধুনিক এক জীবন-মাত্রা। একশ বছরেরও বেশি আগে রচিত পো-র কবিতায় সে ব্যঞ্জনা প্রত্যাশাও করা চলে না। হেলেন-এর জায়গায় বনলতা সেন আসাতে দুটি কবিতার দৃষ্টিকোণ ও অভিক্ষেপণ বদলে গেছে—বলা বাহুল্য। 'টু হেলেন' কবিতার দ্বিতীয় স্তবকে পো হেলেনকে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন 'Thy hyacinth hair' ও 'Thy classic face'। 'চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা'ও সুন্দর কিন্তু 'হায়াসিন্থ হেয়ার'-এর অসামান্য ব্যঞ্জনা তাতে আসেনি। 'হায়াসিন্থ' জলজ উদ্ভিদ। উজ্জ্বল গভীর সবুজ রঙ ও নানা বর্ণের ফুল তার। কিন্তু আসল সৌন্দর্যটি অন্য জায়গায়। হায়াসিন্থ-এর মূল দীর্ঘকাল প্রাণবীজময় থাকে। জল থেকে তুলে নেবার পর গোলাকৃতি শিকড় শুকিয়ে বহুদিন পড়ে থাকলেও আবার জলসিঞ্চিত হলেই তা সবুজ পাতা মেলে দেয়। হায়াসিন্থ যেন অমর, যেন যুগে যুগে নতুন করে বাঁচে। হেলেন-এর সৌন্দর্যে ঐ চিরায়ত পুনর্জায়মানতার মাত্রাটি আরোপ করেছেন এডগার অ্যালান পো। জীবনানন্দ কোনো পৌরাণিক নায়িকার চিত্রকল্প গ্রহণ করেননি বলে পুনর্জায়মানতার অনুভূতি নিয়ে আসার প্রয়োজন হয়নি ততটা। কবিতার প্রারম্ভে 'হাজার বছর' বলেই তিনি চিরকালীনতা বুঝিয়ে দিয়েছেন। 'বিদিশার নিশা' তাঁর কবিতায় অন্য উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেছে। 'মুখ তার

শ্রাবস্তীর কারুকার্য' 'ক্ল্যাসিক ফেস'-এর তুলনায় কিছুটা ছোট হয়ে ধরা দিয়েছে, তবু ভারতীয় ভাস্কর্যের ঐতিহ্য চিত্রকল্পটিকে দিয়েছে এক নিজস্ব দ্যুতি। কিন্তু জীবনানন্দের মূল কৃতিত্ব অন্যত্র। পো ব্যবহার করেছিলেন পাশ্চাত্য পাঠকের মনের হেলেন-সংক্রান্ত সংস্কার-সঞ্চিত ভাবানুষঙ্গ (স্টক-রেসপন্স)। জীবনানন্দ মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজের নাম ও ভাষাসহ সামান্যমাত্র প্রাচীন উপাদান ব্যবহার করে বনলতা সেনকে আশ্চর্য এক কালোত্তীর্ণতা ও অন্তরঙ্গতা একত্রে দান করেছেন। হেলেন সম্পর্কে 'যত মুগ্ধতাই থাকুক—হেলেন সেই স্টক রেসপন্স-এই ধরা থাকে—দূর প্রাসাদশিখরে দাঁড়ানো, বহু সমুদ্রযান নিমজ্জিত করা, অকল্পিত রূপ-প্রতিমা কোনো ক্লান্ত প্রাণের কাছে নেমে আসে না; চোখ তুলে জিজ্ঞাসা করে না—'এত দিন কোথায় ছিলেন!' পাশ্চাত্য কবিতার অনুসৃতির কথায় দু'একবার মনে হয় কীটস্-এর 'অন্ ফার্স্ট লুকিং ইনটু চ্যাপ্‌ম্যান্'স্ হোমার' কবিতার 'Much have I travelled' অংশটি হয়তো 'অনেক ঘুরেছি আমি'-র মধ্যে ধরা আছে।

তৃতীয় স্তবকে এসে পো এবং জীবনানন্দের কবিতা দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন পথগামী হয়। পো কল্পনা করেছেন আলো হাতে হেলেনকে, যেন সে বহন করছে কোনো 'হোলি ল্যান্ড'—তীর্থভূমির আশ্বাস। এই স্তবকটির কিছুটা ভাবানুবাদ—হেলেন প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে—ঢুকে গেছে 'বনলতা সেন' কবিতা সংকলনের (১৯৫২ সংস্করণ) 'মিতভাষণ' কবিতার দ্বিতীয় স্তবকে—

অনেক সমুদ্রে ঘুরে ক্ষয়ে অন্ধকারে
দেখেছি মণিকা-আলো হাতে নিয়ে তুমি
সময়ের শতকের মৃত্যু হলে তবু,
দাঁড়িয়ে রয়েছে শ্রেয়তর বেলাভূমি :

জীবনানন্দ 'বনলতা সেন' কবিতার তৃতীয় স্তবকে সম্পূর্ণ ডুবে গেছেন আত্মমগ্নতার গভীরে। বনলতা সেন সেখানে আছে কিন্তু ঠিক শরীরী রূপে নয়। শুধু প্রেমিকারূপেও তখন আর তাকে ধরে না। তখন বনলতা সেন একটি অনুভবের নাম—জীবন-কলরবের শেষ ঝঙ্কার মিলিয়ে যাওয়া এক পূর্ণ নীরবতার রেশ যেন। তাকে তখন এক প্রশান্ত মৃত্যুবোধের প্রতিমাও বলা চলে। জীবনানন্দের সব কবিতাতেই আছে সময়চেতনার প্রসার এবং মৃত্যুবোধ সময়চেতনারই একটি মাত্রা। সে কারণেই বোধহয় তাঁর কবিতায় ঘটে মৃত্যুবোধের অব্যর্থ সঞ্চার। এই কবিতার শেষ স্তবকে ঘন হয়ে আসে মৃত্যুমগ্নতার ছায়া।

প্রথমেই নিঃশব্দে আসে 'শিশিরের শব্দের মতন সন্ধ্যা'। দিন শেষের বর্ণনা পার্থিব জীবনশেষের ইঙ্গিত দেয়। 'ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল'—প্রাণের উষ্ণতাও মুছে যেতে থাকে মানুষের জীবন থেকে। অভ্যস্ত করণ-কৌশল—ইন্দ্রিয়-বিপর্যয়ী শব্দসজ্জার সাহায্যে কবি গাঢ় করে তুলেছেন অনুভবের ছবিটিকে। ক্রমে মৃত্যুবোধ আরো ঘন হয়ে আসে। 'পৃথিবীর সব রঙ নিভে গেলে' আসে অন্য রঙের পালা। পরপারের আলো ছায়া ফেলে জীবন-পাণ্ডুলিপির ওপর। 'পাণ্ডুলিপি' 'গল্প' ইত্যাদি শব্দকে 'জীবন' বা 'চেতনা' অর্থে অন্যত্রও ব্যবহার করেছেন কবি। এপারের জীবনের গল্প শেষ হতে চলেছে। এবার পরপারের জীবনের গল্প লেখা হবে পাণ্ডুলিপিতে। পঞ্চম পঙ্‌ক্তিতে 'সব পাখি ঘরে আসে'—একটি স্বাভাবিক দিনাবসান ও সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার ছবি। জীবনাবসানের কথা বেশ দ্ব্যর্থহীনভাবেই বলা হয়েছে পঞ্চম পঙ্‌ক্তির শেষাংশে, 'ফুরায় এ-জীবনের সব লেনদেন'। সবচেয়ে তাৎপর্যময় মধ্যবর্তী অসম্পূর্ণ বাক্যখণ্ডটি—'সব নদী—'। নদীর সমুদ্রে লীন হওয়া ঠিক মৃত্যু নয়। বিশালতর এক নিঃসীম অস্তিত্বে মিলিত হওয়া। নদী সমুদ্রে পৌঁছলে এক অর্থে নিজের অস্তিত্ব হারায়; অন্য অর্থে পায় এক পূর্ণতর জীবন। তেমনিই

মানবজীবনের লেনদেন, মানবজীবনের স্রোতের শেষে আছে এক অজানা জগৎ—বস্তু অর্থে অন্ধকার, হয়তো অন্য আলো আছে সেখানে :

জাগতিক অর্থে সমাপ্তি, হয়তো বা আছে ভিন্নতর এক চরিতার্থতা। রবীন্দ্রনাথ-কল্পিত মহামরণ—'মহাসুন্দর শেষ'। তারই প্রতীকরূপে যেন বনলতা সেন প্রতিভাত হয় এই শেষ স্তবকে। সেই প্রতীকে মিশে গেছে জীবনের সব আকাঙ্ক্ষা ও সব প্রাপ্তি। মানুষিক প্রেম হিসেবে তা দু'দণ্ডের। কিন্তু সেই ক্ষণিক মুহূর্ত দুটিতেই সংহত হয়ে যায় জীবন, মৃত্যু ও প্রেমের সম্মিলনে এক বিপুল প্রশান্তির উপলব্ধি।

'বনলতা সেন' কবিতার ব্যাখ্যায় মৃত্যুবোধের প্রসঙ্গটি সাধারণত বিশেষ প্রাধান্য পায় না। কিন্তু বোধহয় উপেক্ষা করা যাবে না এই আবহটিকে। জীবনানন্দের পাণ্ডুলিপিতে 'বনলতা সেন' কবিতার যে খসড়া পাওয়া যায় তার প্রথম পঙ্‌ক্তিই হল—'শেষ হল জীবনের সব লেনদেন,/বনলতা সেন।' (জীবনানন্দ দাশের কাব্যসংগ্রহ, ভারবি, ১৯৯৩, পৃ. ৮০০)। একটি পরোক্ষ নিদর্শনও দেখা যেতে পারে। ১৯৪২-এ প্রকাশিত 'বনলতা সেন' কবিতা-সংকলনটি এক প্রবল অভিনব রোমান্টিক কল্পনার উচ্ছ্বাসে বাঙালি পাঠককে আপ্লুত করে ফেলেছিল। সৌন্দর্য, প্রেম ও বিরহ, নিসর্গ, ইতিহাস, জীবন ও মৃত্যুকে ঘিরে বিস্ময়বোধ—এইসব উপাদানকে অবলম্বন করেই রোমান্টিক আবহ-বলয় গড়ে উঠেছে এই কবিতাগুলিতে। এই সংকলনেরই 'শঙ্খমালা' কবিতায় নারী-রূপে মৃত্যুবোধের সঞ্চার স্পষ্ট অনুভব করা যায়—

> কড়ির মতন শাদা মুখ তার,
> দুইখানা হাত তার হিম;
> চোখে তার হিজল কাঠের রক্তিম
> চিতা জ্বলে : দখিন শিয়রে মাথা শঙ্খমালা যেন পুড়ে যায়
> সে আগুনে হায়।

মৃত্যুর ভয়-সঞ্চারী রহস্যময়তা ও নিশ্চিহ্ন পরিশেষের উপলব্ধি এই কবিতায়। 'শঙ্খমালা' 'বনলতা সেন'-এর ভিন্নমুখ। 'বনলতা সেন' কবিতায় মৃত্যুর প্রেমস্পর্শ-তৃপ্ত প্রশান্তিময় মূর্তিই প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। অথবা বলা যায়, নারী-প্রতীকটিতে মিশে গেছে প্রেম, প্রকৃতি, প্রশান্তি, জীবন ও মৃত্যুচেতনার যাবতীয় অনুষঙ্গ।

রবীন্দ্রনাথের 'কল্পনা' কবিতা-সংকলনের 'স্বপ্ন' কবিতাটির সঙ্গে এ কবিতার মিল দেখেছেন অনেকেই। উপাদান-বিন্যাসের কিছুটা মিল আছে কিন্তু উপলব্ধির দিকটি আলাদা। রবীন্দ্ররচনাটি একটি স্বপ্ন-সুন্দর প্রেমের কবিতা। সেখানে চিরমানসীর সন্ধানে কবি-প্রেমিকের মনোভ্রমণ এবং কালিদাসের কালের সুন্দর কল্পনা-পটে প্রেমিকার উপস্থাপনা। প্রেমের অধরা রহস্যবোধ 'স্বপ্ন' কবিতাটিতে আছে কিন্তু মিলনঅনুভব ও প্রেমের পূর্ণতাবোধ সেখানে খণ্ডিত হয় না। সেখানে প্রেম-মধুরতার উপলব্ধি কালিদাসের কালে অতীতচারণাতেই সার্থক হয়েছে, নায়িকার মুখের ভাষায় ধ্বনিত হয়নি আধুনিক কাল। প্রেমের অনির্বচনীয় প্রাপ্তিই উদ্দিষ্ট সেখানে, 'বনলতা সেন' কবিতার মতো জীবন ও মৃত্যুর উপলব্ধি-মিশ্রিত কোনো সম্পূর্ণ অনুভব নয়। রবীন্দ্রনাথের কবিতাটি কবি ও প্রেমিকের মানসযাত্রা, সেখানে নেই সমগ্র মানবজাতির অন্তহীন অনুসন্ধানের ও ক্ষণিক শান্তির ব্যঞ্জনা। 'বনলতা সেন' কবিতাটি তাই মাপে ছোট হলেও বিস্তীর্ণ অভিপ্রায়ী। সে অভিপ্রায় পূর্ণ বৈভবে সিদ্ধকাম হয়েছে কবিতাটির শরীরে। প্রতিটি শব্দ ও বাক্যের যথার্থতম সংস্থানে কবিতাটি দ্যুতিময়। মিশ্রকলাবৃত্ত ছন্দের ধীর গতি ও বিবৃতি-ধর্ম—দুই-ই সুন্দরভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। কোথাও কোথাও সাধু ও কাব্যিক ক্রিয়াপদে মোটামুটি

প্রথাসিদ্ধ মিল-বিন্যাসে, চরণান্তরে ভাবের কিছুটা প্রবহমানতায় ও কিছুটা প্রতি চরণে ভাবকে সীমাবদ্ধ রাখার করণ-কৌশলে কবিতাটির আঙ্গিকে খুব প্রথা-বহির্ভূত আধুনিকতা আপাতদৃষ্টিতে পাওয়া যাবে না। এই রীতিগত শৈলীতেই কবিতাটির ভাবানুষঙ্গের চিরকালীনতা নিখুঁতভাবে ধরা পড়েছে। সবচেয়ে বেশি কুশল কৃতিত্বের নিদর্শন স্তবক বিন্যাসে। প্রথম স্তবকে মানবের অন্বেষণের ছবি। দ্বিতীয় স্তবকে কঠিন অন্বেষণ-অন্তে এক প্রাপ্তি। এই স্তরে এসে মিশেছে তৃপ্তি ও প্রশান্তির বোধ কিন্তু ক্ষণিকতার আবহটি কবি সেখানেও ধরে রাখেন। তৃতীয় স্তবকে সমস্ত কবিতাটিকেই স্থাপন করা হয়েছে এক লোকোত্তর তলে। সেখানে অন্য কোনো কবিতার সঙ্গে 'বনলতা সেন'-এর মিল নেই। সেখানে জীবন ও মৃত্যুর, আলো আর অন্ধকারের যুক্ত বেণীবন্ধন। সেখানেই সব অন্বেষণের অন্তে মানবজীবনের শেষ শান্তি।

সূত্রনির্দেশ

১. এডগার অ্যালান পো-র কবিতাটি সম্পর্কেও আমাদের মনে রাখতে হবে বাস্তবের এক নারীই ছিলেন এই কবিতার উৎস। কিশোর বয়সের বন্ধু রবার্ট স্ট্যানার্ড-এর মা জেন স্টিথ্ স্ট্যানার্ডকে এক ছায়াঘন সন্ধ্যায় জানলায় দাঁড়ানো অবস্থায় প্রথম দেখেছিলেন পো। পাশে রাখা বাতির আলো এসে পড়েছিল তার সুকুমার ও ব্যক্তিত্বব্যঞ্জক মুখে। পো তাঁকেই অভিহিত করেছিলেন তাঁর 'হেলেন' বলে। ১৮২৪-এ জেন স্টিথ স্ট্যানার্ড-এর মৃত্যু হয়। তার কাছাকাছি সময়ে প্রথম খসড়া করা হলেও কবিতাটি প্রকাশ পায় ১৮৩১-এ। কবিতাটি উৎসর্গ করা হয়েছিল শ্রীমতী স্ট্যানার্ডকে। দীর্ঘকাল পো হেলেনরূপে শ্রীমতী স্ট্যানার্ড-এর স্মৃতি লালন করেছিলেন। চির-আরাধ্য সৌন্দর্যময়ী, মাতৃ-প্রতিমা এবং মৃত্যু-প্রতীক—এই তিন অনুষঙ্গ পো-র স্মৃতিতেও মিশে গিয়েছিল।

সুমিতা চক্রবর্তী : কবিতার অন্তরঙ্গ পাঠ জীবনানন্দ বিষ্ণু দে, প্রথম প্রকাশ : বইমেলা ১৯৯৫ প্রমা প্রকাশনী, কলকাতা

সেলিং টু বাইজেনটিয়াম এবং বনলতা সেন—অন্বেষণের কবিতা

ড. বিনয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ডব্লিউ বি ইয়েটস (১৮৬৫-১৯৩৯) এবং জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪)—এই দুই কবির দুটি বিখ্যাত কবিতা যথাক্রমে 'সেলিং টু বাইজেনটিয়াম' এবং 'বনলতা সেন'। এই দুটি কবিতার পাঠ গ্রহণের সময়, দুটি কবিতার ভেতর এক আশ্চর্যজনক মিল আমার চোখে পড়ে। কেননা দুটি কবিতার মূলে রয়েছে অন্বেষণ এবং এই দুটি কবিতাকেই আমার অন্বেষণের কবিতা বলে মনে হয়েছে। দু-জনেরই অন্বেষণের পেছনে রয়েছে জীবনযন্ত্রণা, বিষাদ এবং ক্লান্তি। তাই দু-জনেই হয়েছেন পথিক, বেরিয়েছেন এমন কিছুর খোঁজে যা পেলে দু-জনেই পাবেন শান্তি এবং আনন্দ। শান্তি এবং আনন্দের লক্ষ্যবস্তু এক নয়, উদ্দেশ্য এক এবং তা হল লক্ষ্যবস্তুর অন্বেষণ।

ইয়েটস তাঁর পরিক্রমায় বেরিয়েছেন সমুদ্রের পথে এবং জাহাজে চড়ে। কবিতার 'Sailed the seas' তা-ই বলে। অবশ্যই এ-কবির কল্পলোকের যাত্রা, 'হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে'। জীবনানন্দ সমুদ্রের পথ ধরে, হাঁটা পথে চলেছেন, 'কোথায় পাব তারে'—তারই অন্বেষণে। তাঁরও এই পথচলা কল্পনায়। কেননা 'হাজার বছর ধরে' কেউ পথ হাঁটতে পারে না। আর হাজার বছরের পরমায়ু পাওয়া, সে তো কল্পনারও বাইরে।

সুতরাং এই দুই কবিই পথিক হয়েছেন অন্বেষণের উদ্দেশ্যে এবং এই যাত্রা দুই কবির ক্ষেত্রেই মানসভ্রমণ, যা কালাতীত হয়েছে এই দু-জনের দুটি কবিতাতেই।

ইয়েটসের 'সেলিং টু বাইজেনটিয়াম' তাঁর বিখ্যাত কবিপর্বের রচনা। এই কবিপর্বকে আমরা 'টাওয়ার পিরিয়ড' বলে থাকি। ইয়েটস এই বিশেষ টাওয়ার পর্বে জীবনকে দেখতে চেয়েছেন সামগ্রিকভাবে। কল্পলোকের চূড়ায় দাঁড়িয়ে তাঁর এই পর্যবেক্ষণ।

'সেলিং টু বাইজেনটিয়াম' কবিতার গুরুত্বে কবি তাঁর মানসিক যন্ত্রণা এবং ক্ষোভের কথা প্রকাশ করেছেন। বুঝতে অসুবিধা হয় না, কবি জীবনের এই মধ্যাহ্নে এসে নতুন জীবনদর্শনের খোঁজ করছেন। তাঁর সময় এবং কাল এই জীবনদর্শনের অন্তরায়। তাই 'that is no Country for old' বলে কবি বিলাপ করেছেন। এবং নতুন জীবনাদর্শনের খোঁজেই কবি বেরিয়েছেন। তাঁর মনে হয়েছে, অতীতের গৌরবমণ্ডিত 'বাইজেনটিয়াম'ই তাঁকে দিতে পারে এই জীবনদর্শন। তাই,

> 'I have sailed the seas and come
> To the holy city of Byzantium'

টাওয়ার পিরিয়ডের অনেক কবিতাতেই রয়েছে আত্মসমীক্ষা, সমকালীন যুগের সমালোচনা। ম্যাথু আর্নল্ডের মতো ইয়েটসের কবিতাও অনেকাংশে হয়ে দাঁড়িয়েছে 'criticism of life'. এই কবিতার প্রথম স্তবকে কবি যে চিত্রকল্পের ব্যবহার করেছেন, তার মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে তৎকালীন মানুষের জীবনাবস্থা। যে জীবন তিনি চোখের সামনে দেখেছেন, সেই জীবন কবির

কাছে আর আকাঙ্ক্ষিত নয়। তিনি ক্লান্ত, মানসিক যন্ত্রণায় পীড়িত। তাই রবীন্দ্রনাথের 'পরশ পাথর' কবিতার ক্ষ্যাপার মতো তাঁরও খোঁজ সেই পরশ পাথরের জন্য, যে পরশ পাথর তাঁকে জীবনের ইন্দ্রিয়পরায়ণতা থেকে মুক্তি দেবে, ও নতুন জীবনবোধে উদ্দীপ্ত এবং উদ্বোধিত করবে। সেই কারণেই কবির কল্পলোকের এই যাত্রা 'সুদূরের আহ্বানে'। ইয়েটসের বাইজেনটিয়াম অন্বেষণের পেছনে যে প্রেরণা কাজ করেছে তা হল,

> "Now I am trying to write about the state of my soul, for it is right for an old man to make his soul, and some of my thoughts upon the subject I have put into a poem called 'Sailing to Byzantium'.
> ...Byzantium was the centre of European civilization and the source of its spiritual philosophy. so I symbolise the search for the spiritual life by a journey to that city." (৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৩১ বেলফাস্ট রেডিও স্টেশন থেকে প্রদত্ত ভাষণের অংশ)

'টাওয়ার' পিরিয়ডের কবি ষাট বছরে পৌঁছেছেন। এই বয়স ব্রাউনিঙ-এর রবাই-এর মতো বলে, The last of life

for which the first was made.

আর ইয়েটসও তাই বলেন, 'That is no country for old men'. That বলতে তিনি সমকালীন যুগের কথাই বলতে চেয়েছেন। এ যেন এলিয়টের The Waste Land কবিতার কথাই মনে করিয়ে দেয়।

ইয়েটস মনে করেন তাঁর সময় এবং কাল তাঁর জীবনদর্শনের অন্তরায়। নতুন আত্ম-উপলব্ধির কারণেই কবির এই অন্বেষণ এবং সমুদ্রপথে বাইজেনটিয়ামের উদ্দেশে তাঁর এই মানসযাত্রা।

'বনলতা সেন' কবিতায় কবি যে 'হাজার বছর ধরে' 'পৃথিবীর পথে' হেঁটে চলেছেন তার মূলেও রয়েছে অন্বেষণ, অভীষ্টকে পাবার জন্য। এই কবিও জীবনযন্ত্রণায় 'ক্লান্ত প্রাণ' একজন পীড়িত ব্যক্তিসত্তা, যিনি খুঁজে চলেছেন, 'হালভাঙা' 'দিশাহীন' নাবিকের মতো এমন কিছু, যা পেলে তাঁর যন্ত্রণা-পীড়িত দেহমন শান্তি অনুভব করবে।

'বনলতা সেন' কবিতার রচনাকাল আনুমানিক ১৯৪৩। অর্থাৎ ইয়েটসের 'সেলিং টু বাইজেনটিয়াম' কবিতার রচনাকালের প্রায় কুড়ি বছর পর কবিতাটি লেখা। ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক জীবনানন্দ যে ইয়েটসের এই বিখ্যাত কবিতার সঙ্গে পরিচিত হননি, এমন মেনে নেওয়া কঠিন। (যেহেতু তিনি নিজেও একজন কবি; তাই জীবনদর্শন ভিন্ন হলেও, 'বনলতা সেন'-এর অন্বেষণের এই ব্যাপারটির ভেতর ইয়েটসের 'সেলিং টু বাইজেনটিয়াম' কবিতার অন্বেষণের প্রভাব থাকা স্বাভাবিক)। দুটি কবিতার বিষয়বস্তু যেহেতু অন্বেষণ, আমরা মনে করতে পারি, ইয়েটসের 'বাইজেনটিয়ামের' অন্বেষণের স্পৃহা জীবনানন্দকেও প্রভাবিত করেছিল এবং 'বনলতা সেন' কবিতাটিও 'সেলিং টু বাইজেনটিয়াম'-এর মতোই তাই হয়ে উঠেছে যথার্থ একটি অন্বেষণের কবিতা।

ইয়েটস এবং জীবনানন্দ দু-জনেই রোমান্টিক চেতনার অধিকারী। ওয়ালটার পেটার যে রেনেশাঁস অফ ওয়ান্ডারকে রোমান্টিক কবিতার অন্যতম উপাদান বলেছেন, সেই উপাদান কিন্তু ইয়েটস এবং জীবনানন্দর কবিতায় অদ্ভুতভাবে এসেছে। বাইজেনটিয়াম, ইয়েটসের কবিচেতনার উন্মেষ ঘটিয়েছে। অন্যদিকে বনলতা সেনের অবর্ণনীয় সৌন্দর্যে এসেছে কবিকল্পনার এই রেনেশাঁস।

> 'চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা
> মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য।'

তাছাড়া, এই দুটি কবিতার ভেতরেই এসেছে সমুদ্রের কথা। 'বনলতা সেন' কবিতায় কবির যাত্রা সমুদ্রের পথ ধরে। আর ইয়েটসের কবিতায় সমুদ্রের পথ পার হয়ে বাইজেনটিয়ামে পৌঁছে এযাত্রার সমাপ্তি। রোমান্টিক চেতনায় সমুদ্রের উপমায় 'কোথাও আমার হারিয়ে যাবার নেই মানা'র ইঙ্গিত। কোনো শৃঙ্খলার বন্ধন যে কবি-কল্পনাকে বাঁধতে পারে না তার চমৎকার নিদর্শন এই দুটি কবিতা। নইলে ইয়েটসই বা কী করে আসেন সেই অতীতের বাইজেনটিয়ামে এবং জীবনানন্দই বা কী করে বিচরণ করেন ইতিহাস এবং ভূগোলের অতীত দিনের পাতায়—

'সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে
অনেক ঘুরেছি আমি,
বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে
আরো দূর অন্ধকারে বিদর্ভ নগরে।'

ইয়েটসের কবিতায় যে অন্বেষণ তার সঙ্গে জীবনানন্দের অন্বেষণের মিল নেই। ইয়েটসের কবিতায় কবির যুগযন্ত্রণাকে অতিক্রম করার প্রয়াস রয়েছে। এই প্রয়াস শ্রেয়বোধের মানসিকতায় উদ্দীপ্ত এবং প্রোজ্জ্বল। কবির নবজীবনে দীক্ষা হয়েছে বাইজেনটিয়ামে। এখানে তিনি শুনেছেন নতুন জীবনের বাণী, যে বাণী ছিল তার কাছে অজ্ঞাত এবং অশ্রুত। তাই তিনি জাগতিক জগৎ থেকে নিজেকে মুক্ত করে সীমাহীন অনন্তের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে চেয়েছেন। শিল্পের আধার করে নিজেকে নতুন করে জন্ম দিয়েছেন। এখানে তিনি শাশ্বত, চিরন্তন।

জীবনানন্দের অন্বেষণের মূলে রয়েছে নারীর প্রেম। জীবনানন্দ এই কবিতা যখন লিখলেন, তখন তাঁর বয়স ৪৩। এই বয়সে প্রৌঢ় কবি ইয়েটসের সেই প্রাজ্ঞ দর্শন যদি তাঁর মধ্যে কাজ করত সেটাই অত্যন্ত বিস্ময়ের ব্যাপার বলে মনে হত। যে কারণে ইয়েটস তাঁর যুগ থেকে বেরিয়ে আসতে চেয়েছেন, 'Caught in that sensual music all neglect/ Monuments of unageing intellect', সেখানে জাগতিক ভোগস্পৃহার বিরোধী ভাব কাজ করেছে। অন্যদিকে জীবনানন্দ অনুসন্ধান করেছেন সেই প্রেমের, যে প্রেম তাঁকে 'দু-দণ্ড শান্তি' দেবে। ভুলিয়ে দেবে জীবনের দুঃখ, বেদনা এবং একাকিত্ববোধের নির্মম যন্ত্রণা। ইয়েটসের 'বাইজেনটিয়াম' অপার্থিব চেতনায় দীপ্ত। অন্যদিকে 'বনলতা সেন' পার্থিব এবং জাগতিক জীবনবোধে মঞ্জরিত। বনলতা সেন কবির কাছে চিরন্তন প্রেমের প্রতীক, যেন একটি মিথ। বনলতা সেনের পথিক-কবি কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা পথিক নয়। সে হচ্ছে প্রতিটি নিঃসঙ্গ মানুষের প্রতিনিধি, যার বুকের ভেতর শূন্যতা, বিষাদ এবং ক্লান্তি। সে বহন করে চলেছে প্রতিটি নিঃসঙ্গ মানুষের অন্বেষণের স্পৃহাকে। সমুদ্রের উপকূল থেকে ইতিহাসের জগতে তার এই পদসঞ্চার। সে তো জানে না, কোথায় লুকিয়ে আছে সেই পরশ পাথর, যার ছোঁয়ায় আছে স্পর্শমণি, যা দুঃখের, ক্লান্তির অবসাদকে দূর করে দিতে পারে, দিতে পারে 'দু-দণ্ড শান্তি' এবং আনন্দ। শান্তি এবং আনন্দ এই দুটিই মানুষের কাছে পরম আকাঙ্ক্ষিত। ইয়েটসের 'বাইজেনটিয়াম' সেই শান্তি এবং আনন্দের প্রতীক। অন্যদিকে 'বনলতা সেন' কবিতায় কবি নারীর প্রেমের ভেতর কিছু সময়ের জন্য সেই শান্তি এবং আনন্দ পেয়েছেন। এই প্রেমে ক্লেদ নেই, মালিন্য নেই। বনলতা সেনের প্রেম পাখির নীড়ের মতো, স্নিগ্ধতায় ভরা, এখানে কীটসের 'La Belle Dame sans merci' কবিতার মতো কোনো সর্বনাশের ইঙ্গিত নেই, ক্ষতবিক্ষত হবার কারণ নেই। এখানে আছে 'সবুজ ঘাসের দেশে' পরস্পরের মুখোমুখি বসে অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎকে সময়াতীত করে নেওয়া। ইয়েটসের 'বাইজেনটিয়াম' কবিতাতেও রয়েছে সেই 'What is past or passing or to come'-এর

কথা। বাস্তব জীবনে কবি এবং বনলতা সেন দু-জনেই সময়ের শিকার, যেখানে হাজার বছর নিছক কল্পনাবিলাস ছাড়া আর কিছু নয় এবং 'মুখোমুখি বসিবার' এই ব্যাপারটিও একটি তাৎক্ষণিক ব্যাপার মাত্র। কিন্তু শিল্পে বা কবিতায় তাৎক্ষণিক চিরায়িত হয়ে ওঠে। এখানে কোনো কিছুরই পরিবর্তন হয় না। তাই কীটসের সেই 'গ্রেসীয়ান' কবিতায় যে বাঁশিবাদক গাছের নিচে বসে বাঁশি বাজায় তার সেই বাঁশির সুর সময় এবং কালের সব ব্যবধান ঘুচিয়ে প্রবহমান কাল ধরে সেই চিরসবুজ গাছটির নিচে বেজে চলে। জীবনানন্দের বনলতা সেন এবং পথিক কবি একইভাবে মুখোমুখি বসে গেঁথে যায় প্রেমের মালা। আরাধ্যকে পাবার জন্য মানুষের অন্বেষণ একটা যুগাতীত ব্যাপার। যুগাতীত এই ব্যাপারটাকেই কবি 'হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটতেছি পৃথিবীর পথে'—এই অসাধারণ চিত্রকল্পের মধ্যে ধরতে চেয়েছেন। বনলতা সেন যখন প্রশ্ন করে, 'এতদিন কোথায় ছিলেন?'—তখন মনে হয় নারী এবং পুরুষের এই মিলনের প্রতীক্ষা এবং এরই অন্বেষণ যেন জীবনানন্দ দাশের 'বনলতা সেন' কবিতার মূল কথা। যেমন করে পথিককবি খুঁজে চলেছে হাজার বছর ধরে তার মানসীকে পাবে বলে, ঠিক একইভাবে হাজার বছর ধরে প্রতীক্ষায় রয়েছে বনলতা সেন তার আকাঙ্ক্ষিত প্রেমাস্পদের জন্য। পথিকের মতো বনলতা সেনও নিঃসঙ্গ একা। নইলে কেন সে বলে, 'এতদিন কোথায় ছিলেন?' অর্থাৎ কিনা, আমিও তো এতদিন ধরে অপেক্ষায় আছি এই মিলনের অভিসারের জন্য। 'বনলতা সেন' কবিতায় বনলতা সেন এবং পথিক, দু-জনেই কিন্তু 'আর্টিফিস' হয়ে গিয়েছেন, যার অতীত নেই, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ নেই। সে হচ্ছে হাজার হাজার বছরের সেই প্রবহমান কাব্যসত্য, যা ইয়েটসের 'সেলিং টু বাইজেনটিয়াম' কবিতায় কিংবা কীটসের 'ওড অন আ গ্রেসীয়ান আর্ন'-এ মূর্ত হয়ে উঠেছে। বাস্তব জীবনে প্রেমিক-প্রেমিকার যে মিলন, সে কোনো চিরস্থায়ী ব্যাপার নয়। অন্ধকারে, নিভৃতে দু-জনের যে আলাপন তাও সুদীর্ঘ সময়ের জন্য হতে পারে না। বাস্তব জীবনে তা সম্ভবও নয়। এটা একমাত্র সম্ভব শিল্পে এবং কল্পনায় তথা সাহিত্যে। তাই 'বনলতা সেন' কবিতাটির শেষ অংশটিতে পথিক এবং বনলতা সেনের অন্ধকারে মুখোমুখি এই বসা এবং প্রাণের আলাপন, কোনো ক্ষণিকের খণ্ড ব্যাপার নয়। তাঁরা দু-জনেই কাব্যসত্যের দুই প্রতীক। এত হাজার বছর পর তাঁদের সাক্ষাৎকারের ব্যাপারটিকে কবি চিরন্তন করে দিলেন 'মুখোমুখি বসিবার' এই আয়োজনের ভেতর। কেননা এই কবিতায় দুটি হৃদয়কে সব সময়ই দেখা যাবে, অন্ধকারে মুখোমুখি বসে দু-জনে বলে চলেছে তাদের হৃদয়ের না ফুরানো প্রেমের সংলাপ।

ইয়েটস অন্বেষণে বেরিয়ে শাশ্বতকে পেয়েছেন। জীবনানন্দের পথিকও পেয়েছে সেই শাশ্বতকে। ইয়েটসের শাশ্বতের চেতনায় উত্তরণের ইঙ্গিত। জীবনানন্দে তা নেই। না থাকলেও বনলতা সেন পথিকের কাছে এবং বনলতা সেনের কাছে পথিক—শাশ্বত প্রেমেরই প্রতীক। দুটি কবিতার ভেতর সাদৃশ্য যেমন অন্বেষণের স্পৃহার ভেতর আমরা খুঁজে পাই, অন্যদিকে দুটি কবিতার কাব্যভাস্কর্যও আমাদের মুগ্ধ করে। বিস্মিত করে শিল্পভাস্কর্যের চিত্রকল্পের ব্যবহার। বাইজেনটিয়াম আর্টের চিত্রকল্প ইয়েটসের 'সেলিং টু বাইজেনটিয়ামে' আর 'বনলতা সেন' কবিতায় বনলতা সেনের মুখের সৌন্দর্য বর্ণনা করতে গিয়ে শ্রাবস্তীর কারুকার্যের সঙ্গে সেই রূপের তুলনা।

বনলতা সেনকে মনে হয় না সবটাই মানবী সে। মনে হয় সে যেন কবির কল্পনার তিলোত্তমা, কবি-মানসী। বনলতা সেনের চুল চোখ এবং মুখের বর্ণনায় উপমার ব্যবহারে কবি কাল এবং সময়ের ব্যাপারটিকে অসাধারণ নান্দনিক সৌন্দর্যে উন্নীত করেছেন। ফলে কবিতাটি শুধু কবির কাছেই নয়, বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে একটি 'ক্লাসিক' কবিতা হয়ে উঠেছে।

বিষয় জীবনানন্দ : শৌনক বর্মণ সম্পাদিত, প্রথম সংস্করণ : মে ১৯৯৮

জীবনানন্দ দাশের 'বনলতা সেন'

অনিল কুমার রায়

'বনলতা সেন'-এর নায়ক 'হাজার বছর' ধরে পৃথিবীর পথ হেঁটে ক্লান্ত। ভূগোল ও ইতিহাসের ক্ষুদ্র গণ্ডি ভেঙ্গে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন যুগে সে সন্ধান করে ফিরেছে তার কাঙ্ক্ষিতকে। সিংহল সমুদ্র, মালয় সাগর, বিম্বিসার অশোকের জগৎ বিদর্ভ নগর অনুসন্ধান শেষে নাটোরে এসে তার 'পথ হাঁটা'র পরিসমাপ্তি। কেননা এখানেই তার সন্ধান পেয়েছে সে, যে তাকে দিতে পারে শান্তি, সৌন্দর্য, আশ্রয় ও প্রেম—সেই নারী, যার নাম বনলতা সেন। আবহমান কাল থেকেই তো তাকে চেয়ে এসেছে সে—বনলতা সেন-এর নায়ক—পুরুষ। তাই তার সন্ধান ক্ষুদ্র ভৌগোলিক অঞ্চলে সীমায়িত নয়, বিশ্বব্যাপ্ত। আবার তা ইতিহাসের সীমা অতিক্রম করে সময়ের প্রবহমানতায় বিস্তৃত হয়েছে স্মরণাতীত অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত।

এই নারীর সান্নিধ্যে শান্তি। নায়কের পথ চলার সমস্ত ক্লান্তি, জীবনের নিঃসঙ্গতা, সমুদ্রে হাল ভেঙ্গে দিশাহীন হওয়ার মত অসহায়তার কথা সব ভুলিয়ে দিয়ে তাকে 'দু-দণ্ড শান্তি দিয়েছিল নাটোরের বনলতা সেন'। বনলতা সেনের রূপ বর্ণনায় তার পূর্ণ অবয়বের চিত্র আঁকেন নি কবি। আমরা জানি না তার হাত, নখ, স্তন, কোমর, পা ইত্যাদির কোন বিবরণ। কিন্তু নারীর সৌন্দর্যের আরো মাপকাঠি আছে—তার চুল, নখ, চোখ। জীবনানন্দ তার চুল, মুখ ও চোখের বর্ণনা দিয়েই তাকে অপরূপা করে তুলেছেন। 'চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা', 'মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য', 'পাখির নীড়ের মতো চোখ' তার। বিদিশা, শ্রাবস্তী ও পাখির অনুষঙ্গে এসেছে তার চুলের ঘন কৃষ্ণত্ব, মুখের শিল্পসুষমা ও চোখের আশ্রয়ময়তা। সেই কবেকার বিদিশার হারানো ইতিহাস, শ্রাবস্তীর শিল্প-গৌরব, আর প্রকৃতির আশ্রয়ের প্রশান্তি দিয়ে কি এক আশ্চর্য সৌন্দর্য সৃষ্টি করলেন জীবনানন্দ! যা বাংলা সাহিত্যে তাঁর আগে আর কেউ করতে পারেন নি।

নায়ক মুগ্ধ বিস্ময়ে বনলতা সেনের মুখের দিকে তাকিয়ে, প্রাপ্তির পরিতৃপ্তি নিয়ে। যেমন করে সমুদ্রে হালভাঙ্গা দিশাহারা নাবিক দারুচিনি দ্বীপের ভিতর সবুজ ঘাসের দেশ দেখে পুলকিত হয়, তেমনি তার মনের ভাব। কিন্তু নায়ক বলছে, 'তেমনি দেখেছি তারে অন্ধকারে'। অন্ধকারে কি দেখা যায়? দেখা গেলেও তা আবছা, কখনোই স্পষ্ট নয়। অথচ স্পষ্ট করে ভালভাবে না দেখলে বনলতা সেনের চুল, মুখ ও চোখের বর্ণনা এত নিখুঁতভাবে সে দেয় কি করে? হোক না সে তার পূর্বপরিচিতা। মাঝখানে তো হাজার বছরের না-দেখার ব্যবধান। আসলে এ 'অন্ধকারে' সে অন্ধকার নয়। এ হল জীবনের দিশাহীনতার, নৈরাশ্যের অন্ধকার। আলোকেই দেখা, কিন্তু সংকটের অন্ধকার সময়ে। নায়ক দেখছে 'অন্ধকার'—তার জীবনের অসহায় সময়ে। বনলতা সেন-ও নায়ককে দেখছে একই সময়ে। তার জীবন শান্ত, কোন ক্লান্তি বা বিপর্যয় নেই। তার জীবনে অন্ধকার নেই। তাই সে নায়ককে দেখে আলোয় এবং জিজ্ঞাসা করে, 'এতদিন কোথায় ছিলেন?'

প্রশ্নটির মধ্যে একদিকে যেমন জানার কৌতূহল, অন্যদিকে তেমনি এতদিন না আসায় মৃদু অনুযোগ এবং দীর্ঘ অনুপস্থিতির পর ফিরে আসায় মিলনের সংযত আকুতি ও আহ্বান ব্যক্ত হয়েছে। নায়কের দিশাহারা ক্লান্ত জীবনে এইভাবে আসছে আশ্রয়দানের এক প্রচ্ছন্ন প্রতিশ্রুতি। বনলতা সেনের 'পাখির নীড়ের মতো' চোখেও রয়েছে সেই প্রতিশ্রুতির আভাস। 'চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন'—তরঙ্গোচ্ছ্বাসে ফেনায়িত জীবন সমুদ্র—চলমান জীবনের কলরব, চঞ্চলতা। কিন্তু হাজার বছর ধরে পথ হেঁটে হেঁটে সে ক্লান্ত। সেই আশ্রয় তার চাই। শেষ স্তবকে এসে দেখি সে আশ্রয় সে পেয়েছে বনলতা সেনের প্রেমে।

দিন শেষ হয়। সন্ধ্যা আসে নিস্তব্ধ, 'শিশিরের শব্দের মতন'। চিলের সারাদিনের ওড়াউড়িও শেষ হয়, 'ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে' ফেলে রাতের বিশ্রামের জন্য তার প্রস্তুতি। আলো নিভে গেলে পৃথিবীর সব রূপ, সব রঙ হারিয়ে যায় অন্ধকারে। জোনাকির আলোয় ঝলমলিয়ে ওঠে চারদিক। গল্প শোনার আবেশ সৃষ্টি হয়। পাণ্ডুলিপি নতুন গল্প শোনাবে জীবনের—এ তারই আয়োজন। পাখিরা ফিরে আসে ঘরে। সব চঞ্চলতা, কোলাহল, চলাচলের বিরতি। বহতা নদীরও এখন বিশ্রাম। (অন্ধকারে তার প্রবাহ দেখা যায় না। তাই কবি কল্পনা করেন তার চলারও যেন শেষ হয়ে যায়)। দেওয়া-নেওয়া প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির হিসাব আর নয়। সব কর্ম ও চিন্তা থেকে মুক্তি নিয়ে অন্ধকারের কোলে সাময়িক শান্তি। কিন্তু নায়কের কাছে এ অন্ধকার শুধু দৈহিক শ্রান্তি অপনোদনের জন্য নয়। এখনই তো, এই অন্ধকারই তো বনলতা সেনের মুখোমুখি বসার উপযুক্ত সময়। তাই সে মনে করে, জীবনের কোলাহল স্তব্ধ হয়ে চারপাশ যখন শান্ত, অন্ধকারে আবৃত, তার জন্য 'থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন'। দিনের আলোতে যখন সে তাকে দেখেছিল তখন তার জীবনে ছিল সংকট, মনে নৈরাশ্যের অন্ধকার। বনলতা সেন তাকে আশার আলো দেখিয়েছিল। তখন তার বাইরে ছিল আলো, ভিতরে অন্ধকার। তাই দেখা সম্পূর্ণ হয়নি। পরিপূর্ণভাবে তাকে পাওয়া হয়নি। বনলতা সেনও তখন দূরত্ব বজায় রেখেছিল; বলেছিল : 'এতদিন কোথায় ছিলেন?' সম্পর্ক তখন নিবিড় হয়নি। সে তাকে বলতে পারেনি 'এতদিন কোথায় ছিলে?' অন্ধকারে সে দূরত্ব যাবে ঘুচে। অন্তরের আলোয় একজন আর একজনকে দেখবে। থাকবে না কামনার কলুষ, দেহের আবিলতা। পরস্পরকে তারা হৃদয় দিয়ে অনুভব করবে। আগের দেখাকে আবার নতুন করে দেখবে। আগের দেখা ছিল শুধু বাইরেটা। এবার দেখবে ভিতর। পথ চলায় ক্লান্ত নায়ক এবার দেখবে—

'কোন এক মানুষীর মনে
কোন এক মানুষের তরে
যে জিনিস বেঁচে থাকে হৃদয়ের গভীর গহ্বরে—
নক্ষত্রের চেয়ে আরো নিঃশব্দ আসনে
কোন এক মানুষের তরে এক মানুষীর মনে।' *(নির্জন স্বাক্ষর)*

দেখবে—

'মানুষের তরে এক মানুষীর গভীর হৃদয়'। *(সুরঞ্জনা)*

সেখানে আশ্রয় নেবে সে। 'বনলতা সেন' কবিতায় অন্ধকার এইভাবে নরনারীর মিলনের চিরন্তন আকাঙ্ক্ষাকে সার্থকতা দান করে।

অনেক সমালোচকের মতে 'ফুরায় এ জীবনের সব লেনদেন'-এর মধ্যে মৃত্যুর ইঙ্গিত আছে। আমার কখনো তা মনে হয়নি। প্রচলিত অর্থে নয়, জীবনানন্দ ব্যাপকতা বোঝাতে বাক্যটি ব্যবহার করেছেন। সারাদিন যারা কর্ম-তৎপর, প্রকৃতিতে বা মানুষের জগতে, তাদের সবাই তো শ্রম ও ক্লান্তির পর বিশ্রাম করে রাতে। 'সব পাখি ঘরে আসে', 'সব নদী'

অন্ধকারে মিশে গিয়ে বিশ্রাম নেয়। তেমনি মানুষের ক্ষেত্রেও সমস্ত কর্মব্যস্ততা, পারস্পরিক লেনদেন ইত্যাদি ভাবনার যেন ইতি ঘটায় সন্ধ্যা এসে। এই প্রসঙ্গে একটি জিনিস লক্ষণীয়। 'বনলতা সেন' কবিতাটির প্রথম ও দ্বিতীয় স্তবকের বিশাল ভৌগোলিক ও সাময়িক প্রেক্ষাপট তৃতীয় স্তবকে সংকীর্ণ করে আনা হয়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় স্তবকে পাই সমুদ্র, তৃতীয় স্তবকে নদী। আবার প্রথম ও দ্বিতীয় স্তবকে হাজার বছরের ব্যাপ্তি শেষ স্তবকে এসে একটি দিনের—সন্ধ্যার—কথায় পরিণত হয়েছে। 'ফুরায় এজীবনের সব লেনদেন'-এ হল একটি দিনের পরিসমাপ্তি। দৈনন্দিন কর্মচঞ্চলতার, জীবনের সব লেনদেনের হিসাব নিকাশের আপাতত অবসান হয় *('ফুরায়')*। এরপর অন্ধকারের শীতলতায় বিশ্রাম। মৃত্যুর ইঙ্গিত থাকলে 'বনলতা সেন' কবিতায় নৈরাশ্যের বা হতাশার সুর থেকে যেত শেষ পর্যন্ত। কিন্তু কবিতাটির শেষে আশাবাদের সুরই স্পষ্ট। যে কবিতায় প্রথম স্তবকে আছে ক্লান্তিতে শান্তি, দ্বিতীয় স্তবকে অসহায়ের আশ্রয়, আর তৃতীয় স্তবকে অন্ধকারে প্রেম, তার মধ্যে মৃত্যুর ইঙ্গিত—morbidity—সামঞ্জস্যহীন। এই morbidity কবিতাটির শান্তি-আশ্রয়-প্রেমের সামগ্রিক আবেদনকে ক্ষুণ্ন করে। তাই জীবনানন্দের অন্যান্য কবিতা থেকে দৃষ্টান্ত টেনে, কবির মানসিকতা বিশ্লেষণ করে, 'বনলতা সেন'-এ মৃত্যুচেতনা আরোপ কখনোই গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়নি।

'বনলতা সেন'-এর আলোচনায় ঐতিহ্যবোধের প্রসঙ্গে এসে পড়ে। টি এস এলিয়ট তাঁর 'Tradition and the Individual Talent' প্রবন্ধে বলছেন,

> 'It (Tradition) involves.... the historial sense...; and the historical sense involves a perception, not only of the pastness of the past, but of its presence...The historical sense, which is a sense of the timeless as well as of the temporal and of timeless and of the temporal together, is what makes a writer traditional.'

বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগৎ, বিদর্ভ নগর, শ্রাবস্তীর কারুকার্য, এমনকি পূর্ববাংলার নাটোরের অনুষঙ্গে অতীত ও বর্তমান একাকার হয়ে গেছে। ইতিহাস কবির বোধের গভীরে কাজ করে তাঁর সৌন্দর্যসৃষ্টিতে সাহায্য করেছে। হাজার বছরের অভিজ্ঞতার স্মৃতিচারণার মধ্য দিয়ে সুদূর অতীতকে সঙ্গে নিয়ে নায়ক বর্তমানে এসে পৌছেছে। 'সুরঞ্জনা' কবিতাতে তা-ই দেখি :

> 'যেন সব অন্ধকার সমুদ্রের ক্লান্ত নাবিকেরা
> মক্ষিকার গুঞ্জনের মতো এক বিহ্বল বাতাসে
> ভূমধ্যসাগরলীন দূর এক সভ্যতার থেকে
> আজকের নব সভ্যতায় ফিরে আসে;'

বনলতা সেনের চুল ও মুখে যে সৌন্দর্য নায়ক প্রত্যক্ষ করে বর্তমানে, সে বর্তমানের সঙ্গে বিদিশার নিশা আর শ্রাবস্তীর কারুকার্য অতীতকে সম্পৃক্ত করে দিয়েছে। আবার 'সবিতা'তেও চুল ও মুখের বর্ণনায় দেখি সেই সম্পৃক্তি :

> 'তোমার নিবিড় কালো চুলের ভিতরে
> কবেকার সমুদ্রের নুন;
> তোমার মুখের রেখা আজো
> মৃত কত পৌত্তলিক খ্রীষ্টান সিন্ধুর
> অন্ধকার থেকে এসে নব সূর্যের জাগার মতন;
> কত কাছে—তবু কত দূর।'

কাল তার প্রবহমানতার মধ্য দিয়ে অতীতকে বর্তমানে পৌছে দিয়ে তার অতীতত্ব ('pastness of the past') খুঁচিয়ে দেয়; অতীত তার আলাদা অস্তিত্ব হারিয়ে বর্তমানের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে, বর্তমানত্ব (এলিয়ট একে বলবেন presentness of the past) লাভ করে। কবি তাঁর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে তা প্রত্যক্ষ করলেন। এই প্রত্যক্ষণের মূলে তাঁর ঐতিহ্যবোধ।

'বনলতা সেন'-এর সঙ্গে Edger Allan poe (১৮০৯-১৮৪৯)-র 'To Helen' কবিতাটি তুলনীয়। কবিতাটি ১৮৩১-এ রচিত। জীবনানন্দ এই কবিতাটি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।

Poe-র কাছে হেলেনের রূপ প্রাচীন নীস-এর (Nice দক্ষিণ-পূর্ব ফ্রান্সের বন্দর) জাহাজের (Barks) মত মনে হয়েছে, যা 'সুরভিত সমুদ্রে'র (Perfumed sea) উপর দিয়ে 'ক্লান্ত, পথশ্রান্ত নাবিক' (The weary, way-worn wanderer)কে আরামে (gently) বয়ে এনে পৌছে দেয় 'তার নিজের জন্মভূমির তীরে' (To his own native land)। কবির কাছে হেলেন যেন এক ক্লান্তিহারিণী, শান্তিদায়িনী, পথচালিনী, আশ্রয়দায়িনী সৌন্দর্যমূর্তি। স্বভূমির সৈকতে ফিরে এসে ক্লান্ত নাবিকের যেমন শান্তি, ভালবাসা ও নিজস্ব আশ্রয় ফিরে পাওয়ার পরিতৃপ্তি, হেলেনের রূপদর্শনেও কবির সেই প্রাপ্তির অনুভূতি। ঠিক যেমন জীবনানন্দের হালভাঙ্গা, ক্লান্ত নাবিক নাটোরের বনলতা সেনের কাছে এসে পায়। বহু সমুদ্র পরিক্রমা শেষে জীবনানন্দের নাবিক ফিরে আসে বাংলাদেশে, স্বভূমে, (রাজশাহী জেলার) নাটোরের বনলতা সেনের কাছে। Poe স্বদেশে ফেরার শান্তিকে বিশেষ জোর দিয়ে বোঝানোর জন্য 'native shore'-এর আগে 'own' শব্দটিও ব্যবহার করেছেন। আর একটি ব্যাপার লক্ষণীয়। poe যেমন 'perfumed sea' ব্যবহার করেছেন, জীবনানন্দও তেমনি ব্যবহার করেছেন 'দারুচিনি দ্বীপ'। দারুচিনি শুধু বৃক্ষ নয়, তার অনুষঙ্গে আসে সুগন্ধ। সেদিক থেকে 'সুরভিত' (সমুদ্র) ও 'চারুচিনি' (দ্বীপ) শব্দ দুটির অর্থগত সামঞ্জস্য আছে।

হেলেনের 'hyacinth hair' [hyacinth-এর বাংলায়ন সম্ভব নয়। এর অর্থ—১. এক ধরনের গুল্ম, ২. তার গুচ্ছবিশিষ্ট সুগন্ধি ফুল (Poe এই পুষ্পগুচ্ছের আকৃতির সঙ্গে হেলেনের কুঞ্চিত কেশের সাদৃশ্য কল্পনা করেছেন সম্ভবত), ৩. কচুরিপানা]-এর সঙ্গে বনলতা সেনের 'চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা', এবং হেলেনের 'classic face' ও বনলতা সেনের 'মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য' তুলনীয়। জীবনানন্দের রূপকল্প এখানে Poe-কে ছাড়িয়ে গিয়েছে। Poe-এর চিত্রকল্প সুন্দর, কিন্তু সাধারণ। জীবনানন্দ অভিনবত্বে অসাধারণ।

হেলেনের 'hyacinth hair', 'classic face' ও জলপরীর মত চলন-বৈশিষ্ট্য (naiad airs') (Naiad—গ্রীক পুরাণের জলপরী) কবিকে মনে করিয়ে দেয় গ্রীসের প্রাচীন গৌরব ('the glory, that was Greece') ও রোমের অতীত ঐশ্বর্যের (the grandeur that was Rome) কথা। Poe-র গ্রীস ও রোম জীবনানন্দে এসেছে বিদিশা ও শ্রাবস্তী হয়ে। Poe-র উত্তাল সমুদ্র ('desperate seas') জীবনানন্দে 'সমুদ্র সফেন'। তবে Poe-র সমুদ্র ভৌগোলিক, জীবনানন্দের সমুদ্র 'জীবনের'।

এ কথা মনে রাখতে হবে যে জীবনানন্দ Poe-কে অনুসরণ করে তাঁর কবিতাটি লেখেন নি। তিনি স্বকীয়তায় উজ্জ্বল। তাঁর ও Poe-র শব্দচয়ন ও চিত্রকল্প ব্যবহারের মধ্যে ভাবগত

সাদৃশ্য থাকলেও জীবনানন্দের শব্দ-চয়ন ও চিত্রকল্প তাঁর সম্পূর্ণ নিজস্ব। তবে এ কথাও স্বীকার করতে হবে যে জীবনানন্দ Poe-র কবিতাটি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।

শেষ স্তবকে Poe হেলেনকে এক খ্রীষ্টীয় পবিত্রতা দান করেছেন। Holy Land-এর রত্নদীপ ('agate lamp') তার হাতে। এইভাবে কবিকল্পনার রূপবতী—গ্রীক পুরাণের হেলেন, যার জন্য রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ, যার রূপের আগুনে ট্রয় ছারখার—শেষ পর্যন্ত জাগতিক জীবনের আশা ও মুক্তির পথ দেখায়। পক্ষান্তরে, অপরূপা হলেও বনলতা সেন সাধারণ নারী—অপৌরাণিক, অনৈতিহাসিক চরিত্র—এবং শেষ পর্যন্তও তাই। Poe হেলেনকে মহত্ত্বে পৌঁছে দিয়েছেন, জীবনানন্দ বনলতা সেনকে একান্ত আপন করে নিয়েছেন। সুতরাং দুষ্টি কবিতার সৌন্দর্যের আবেদন দু'রকমের।

দুটি কবিতাই আয়তনে ছোট। গঠনের দিক থেকে Poe-র কবিতা পাঁচ পঙ্‌ক্তির, তিন স্তবকের; জীবনানন্দের ছয় পঙ্‌ক্তির, তিন স্তবকের। জীবনানন্দের মিল-বিন্যাস : কখ কখ গঘ। Poe মিল-বিন্যাসে বৈচিত্র্য এনেছেন : তাঁর প্রথম স্তবক—কখ কখখ; দ্বিতীয় স্তবক—কখ কখ ক; তৃতীয় স্তবক—কখখকখ। জীবনানন্দের মিল-বিন্যাসের বৈচিত্র্যহীনতা, তাঁর দীর্ঘ পঙ্‌ক্তি ও ধীর উচ্চারণ-লয় তাঁর কবিতার ক্লান্তির effect-এর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

জীবনানন্দের চিত্রকল্প (image) ব্যবহার খুবই তাৎপর্যমণ্ডিত। প্রথম ও দ্বিতীয় স্তবকের চিত্রকল্পগুলি দৃষ্টিগ্রাহ্য (visual)—'বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগৎ', 'জীবনের সমুদ্র সফেন', 'চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা', 'মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য', 'পাখির নীড়ের মতো চোখ'। কিন্তু তৃতীয় স্তবকে এসে আমরা পাই সিনেস্‌থেসিয়া (Synesthesia) বা সিনেস্‌থেটিক্ চিত্রকল্প (Synesthetic image)—যা এক ইন্দ্রিয়ের অভিজ্ঞতাকে অন্য ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অনুভব করা বোঝায়। একটু ব্যাখ্যা করা যাক। 'শিশিরের শব্দের মতন'—শিশিরের সিক্ততা বা শৈত্য আছে, তা স্পর্শেন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করা যায়—যার কোন শব্দ নেই, এখানে তার-ও শব্দ শ্রবণেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অনুভূত হচ্ছে। 'রৌদ্রের গন্ধ'—রৌদ্রের উত্তাপ হল স্পর্শানুভূতির, তার উজ্জ্বলতা দর্শনগ্রাহ্য; কিন্তু ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে তার পরিচয় পাচ্ছি। '(রৌদ্রের গন্ধ) মুছে ফেলে চিল'—এক জটিল (Complex) চিত্রকল্প। রৌদ্রের গন্ধ না হয় ধরে নেওয়া হল, কিন্তু গন্ধ তো বায়ুবাহিত, তা মুছে ফেলা যায় কখনো! গন্ধের যেন রং আছে। অর্থাৎ গন্ধকে এখানে চোখ দিয়ে দেখছি। একই বাক্যে একাধিক সিনেস্‌থেটিক্ অভিজ্ঞতা যুক্ত করে কবি এখানে জটিল চিত্রকল্প সৃষ্টি করেছেন। 'পৃথিবীর সব রং নিভে গেলে...' যখন তিনি বলছেন তখন 'রং' বা 'নিভে যাওয়া' দৃষ্টিগ্রাহ্য হলেও এখানে অভিজ্ঞতার অন্য এক মাত্রা যুক্ত হতে দেখি—কেন না, রং বিবর্ণ হয়, মুছে যায়, ধুয়ে যায়, 'নিভে' যায় না। জীবনানন্দ তাঁর চিত্রকল্পগুলোর সার্থক প্রয়োগ করেছেন 'বনলতা সেন'-এ। কবিতাটির প্রথম ও দ্বিতীয় স্তবকে ভ্রমণের ভৌগোলিক বিবরণ ও বনলতা সেনের শরীরী বর্ণনা। এখানে অভিজ্ঞতা দর্শনেন্দ্রিয়-নির্ভর, চিত্রকল্পগুলিও তা-ই। কিন্তু তৃতীয় স্তবকের অনুভব অন্তর্লোকে—চোখ দিয়ে দেখা নয়, হৃদয় দিয়ে দেখা। তাই শরীরী নৈকট্য আছে, কিন্তু স্পর্শ নেই; কথা নেই, আছে শুধু নীরবতা। এই দেখায় পার্থিব আলোর প্রয়োজন নেই—এ দেখা অন্ধকারে মুখোমুখি বসে দেখা। এই অভিজ্ঞতার প্রস্তুতি হচ্ছে তৃতীয় স্তবকের সিনেস্‌থেটিক্ আবেশ সৃষ্টির মধ্যে। দেখা যাচ্ছে, ইন্দ্রিয় তার নিজস্ব সীমা অতিক্রম করে অন্য অভিজ্ঞতা অর্জনে সক্ষম। এই সীমা অতিক্রম করতে করতে কবি এক সময় চলে যাবেন ইন্দ্রিয়াতীত অভিজ্ঞতায়—সব আলো নিভে গেলে, বনলতা সেনের সঙ্গে অন্ধকারে মুখোমুখি বসে হবে সেই অভিজ্ঞতা। কবি সেই অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছেন সিনেস্‌থেটিক্ চিত্রকল্প দিয়ে, কবিতার ভাবের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে।

'বনলতা সেন'-এ জীবনানন্দ 'অন্ধকার' শব্দটি সরাসরি ব্যবহার করেছেন পাঁচবার। ('নিশীথ', 'নিশা' ও 'সন্ধ্যা'র অনুষঙ্গে আসে আরো তিনবার)। কিন্তু পাঁচবারই ভিন্ন ব্যঞ্জনায়। প্রথম স্তবকে, একবার আলোর অনুপস্থিতি এবং অন্যবার অস্পষ্ট অতীত অর্থে, দ্বিতীয় স্তবকে, একবার সুদূর অতীত, আর একবার জীবনের অবসাদ, দুর্বিপাক, বা অসহায়তা বোঝাতে। এবং তৃতীয় স্তবকে, আলোর অভাব বা রাত অর্থে।

'বনলতা সেন' স্বরের assonance ('চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা'/'থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন'), ধীর লয়, চিত্রকল্প, ইতিহাস-চেতনা, ঐতিহ্যবোধ, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও ইন্দ্রিয়াতীত অভিজ্ঞতা ও ভাব-ব্যঞ্জনায় সুসমন্বিত। এ সৃষ্টি বাংলা সাহিত্যে অনন্য।

আকরগ্রন্থ:

১. জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা (ভারবি, ১৯৬৮)
২. T. S. Eliot—The Sacred Wood (University Paperbacks. Methuen : London, 1966).
৩. Oscar Williams (ed.)—The New Pocket Anthology of American Verse—From Colonial Days to the Present (Washington Square Prss Inc. New York, 1967).
৪. অম্বুজ বসু—একটি নক্ষত্র আসে (দে'জ পাবলিশিং, ১৩৮৩)
৫. অমলেন্দু বসু—ঐ, ভূমিকা।
৬. সুমিত চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'এ সময়', বইমেলা ১৩৯০ সংখ্যা। সুমিত চক্রবর্তীর 'সমীক্ষা : বনলতা সেন' প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য।
৭. Oxford Advanced Learner's Dictionary
৮. Webster Comprehensive Dictionary, International Edition.

প্রসঙ্গ জীবনানন্দ, সুব্রত রায়চৌধুরী সম্পাদিত, দ্বিতীয় সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৯৬, কলকাতা